দ্বীনে ফেরার পর হারিয়ে যেয়ো না

ডা. শামসুল আরেফীন
আবদুল্লাহ আল মাসউদ
আম্মারুল হক
শরীফ আবু হায়াত

আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার (ভ্রষ্টতা) থেকে বের করে আলোতে (হিদায়তের পথে) নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক শয়তান, তারা তাদেরকে আলো (হিদায়াত) থেকে বের করে অন্ধকারে (গোমরাহিতে) নিয়ে যায়। তারা সকলেই অগ্নিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

(বাকারা, ২৫৭)

চীনে ফেরার পর হারিয়ে যেয়ো না

দ্বীনে ফেরার পর হারিয়ে যেয়ো না

ডা. শামসুল আরেফীন
আবদুল্লাহ আল মাসউদ
আম্মারুল হক
শরীফ আবু হায়াত

চেতনা
প্রকাশন

বই : দ্বীনে ফেরার পর হারিয়ে যেয়ো না
সম্পাদক : আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা : ৪১
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

মূল্য : ২০০.০০৳

Dine Ferar Por Hariye Jeyo na
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

উৎসর্গ

মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভি রহ.—
যার মেহনতে ফুলেল বসুন্ধরা,
গাঁদাফুল হলো শেষে কৃষ্ণচূড়া,
উম্মাহর পথে দিলেন হেদায়েতি নিশান,
যুগ যুগ থাকুন মহা মহীয়ান।

সূচিপত্র

১ম পর্ব : দ্বীনে ফেরার পর ১৫

২য় পর্ব : হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত..... ৬৭

৩য় পর্ব : কারও হেদায়াতের নিশ্চয়তা নেই ৮১

৪র্থ পর্ব : আল্লাহর আজাব হতে কেউ নিরাপদ নয়..... ১১১

ভূমিকা

প্রথমেই অসীম ক্ষমতাধর পরম দয়ালু রব্বে কারিমের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর এই নগণ্য অধম গুনাহগার বান্দাকে এত উপকারী একটি বইয়ের কাজের সাথে যুক্ত থাকার তাওফিক দিয়েছেন। এবং প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করে শুরু করছি।

আমি নিজে একজন জেনারেল পড়ুয়া ছাত্র। জীবনের বেশ দীর্ঘ একটি সময় জাহেলিয়াতের মধ্যে কাটিয়েছি। রব্বে কারিম কৃপা করে ২০১৮-এর দিকে দ্বীনের প্রতি সিরিয়াস হওয়া উচিত—মনোভাবের মতো দামি এক নেয়ামত দান করেন। পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা এখনো করে যাচ্ছি, কতটুকু পেরেছি আল্লাহই ভালো জানেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীনের পথে অনেক চড়াই-উতরাই পার করেছি, পরিবারের সাথে, নিজের সাথে। আমাদের জেনারেল লাইনের যারা দ্বীনে ফিরে তাদের ক্ষেত্রে এটাই হয়ে আসছে দেখে আসছি। আমাদের Mashwara গ্রুপে এ জাতীয় কত যে প্রশ্ন আসে, দেখলে প্রায়শই মন খারাপ হয়ে যেত।

করোনার সময়টায় কাছের অনেক মানুষকে দেখেছি দ্বীনের পথে আসতে ও পরবর্তী সময়ে আবার জাহেলিয়াতে ফিরে যেতে। হেদায়াত নামক নেয়ামত পেয়ে পুনরায় জাহেলিয়াতে ফিরে গেলে একজন ব্যক্তির কতটা অধঃপতন হতে পারে, তা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাগুলো থেকে অনেক কিছু দেখার ও শেখার তাওফিক হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

২০২২-এর শেষের দিকে Mashwara Official-এ আমরা একটা লাইভ প্রোগ্রামের আয়োজন করি। টপিক ছিল এ রকম—হেদায়াতপ্রাপ্তির পর হেদায়াত হারিয়ে যায় কেন। কারণ অনুসন্ধান ও উত্তরণের উপায়। এই বিষয়ে মোট চারজন বক্তব্য রাখেন। শুরুতে ডা. শামসুল আরেফীন ভাই, এরপর উস্তায আবদুল্লাহ আল মাসউদ, উস্তায আম্মারুল হক এবং শেষে মো. শরীফ আবু হায়াত ভাই।

আমার কাছে আলোচনাগুলো খুবই চমৎকার লাগে। আমার মন বলছিল, এই চমৎকার কথাগুলো দ্বীনে ফেরা সকল ভাই-বোনের শুনা দরকার। যদি এগুলো ছেপে সবার হাতে পৌঁছে দিতে পারতাম। বিষয়টা উস্তায বোরহান আশরাফীর সাথে শেয়ার করলে তিনিও আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

একটা বিষয় বলে রাখি। এই বইটা যদিও লেকচার থেকে নেওয়া, কিন্তু সেই লেকচার থেকে এখানে পাঠক অনেক বেশি জানতে পারবেন। উস্তায আবু মিদফা সাইফুল ইসলাম পুরা বই সম্পাদনা ও সংযোজন করেছেন। ভেতরে প্রচুর আয়াত-হাদিস ও রেফারেন্স যোগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমিন।

পরিশেষে বইটির ব্যাপারে বলব, একজন মুসলিম, যিনি জন্মসূত্রে মুসলিম হলেও দ্বীনের প্রতি উদাসীন। কিংবা উদাসীনতার এই ধাপ অতিক্রম করে হেদায়াতের পথে এসে পুনরায় হারিয়ে যাবার উপক্রম—উভয় শ্রেণির জন্যেই বইটি সমানভাবে উপকারী।

মুহাম্মাদ মিনহাজুল ইসলাম মঈন
Admin, Mashwara Official.

শুরুর আগে

আল্লাহ্ আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার পর সবচেয়ে বড় যেই নেয়ামত দিয়েছেন সেটা হলো হেদায়াত। যার দুনিয়াতে সবকিছুই আছে কিন্তু হেদায়াত নেই, তার কিছুই নেই। হেদায়াত অর্থ সঠিক পথ। সিরাতুল মুসতাকিম। যে পথে চললে আল্লাহর কাছে যাওয়া যায়। আল্লাহকে পাওয়া যায়।

কেউ চাইলেই হেদায়াত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলা ভালোবেসে যাকে হেদায়াত দেবেন, সে-ই কেবল হেদায়াত লাভ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

> ‘আপনি যাকে ভালোবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে করেন সৎপথে আনয়ন করেন এবং সৎপথ অনুসারীদের সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।[১]

এই আয়াত ওই সময় অবতীর্ণ হয় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। তখন তিনি চেষ্টা করছিলেন চাচা যেন একবার নিজ মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করেন, যাতে পরকালে আল্লাহর সামনে তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করতে পারেন। কিন্তু সেখানে কুরাইশ নেতাদের উপস্থিতির কারণে আবু তালেব ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে যান। কুফরের ওপরই তার মৃত্যু হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এই সময় মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করে স্পষ্ট করে দিলেন যে, তোমার কাজ কেবল পৌঁছে দেওয়া। আর হেদায়াত দান করা আমার কাজ। হেদায়াত সেই ব্যক্তিই লাভ করে

---

[১] সুরা কাসাস : ৫৬।

থাকে, যাকে আমি হেদায়াত দান করি। তুমি যাকে হেদায়াতের ওপর দেখতে পছন্দ করো, সে হেদায়াত পায় না।

হেদায়াত লাভ করার পর কোনো গ্যারান্টি নেই যে, মৃত্যু পর্যন্ত হেদায়াতের ওপর থাকা যাবে। হেদায়াত লাভ করা যেমন কষ্টসাধ্য বিষয়, হেদায়াতের ওপর টিকে থাকা আরও কঠিন বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন একসময় আসবে, যখন মানুষদের জন্য ঈমান ধরে রাখা জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার ন্যায় কঠিন হবে।[২]

বনী ইসরাইলের যুগে এক বড় আবেদ ছিলেন। সারা দিন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তিনি এক নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। একসময় সেই নারীকে তার বাচ্চাসহ হত্যা করেন। শেষে ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন হেদায়াতের ওপর অটল থাকতে কী দুআ করতে হবে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

> ‘হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়ো না। তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করো। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।’[৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

> ‘অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।’

---

[২] তিরমিজি : ২২৬০।

[৩] আলে-ইমরান : ৮।

চারিদিকে এমনভাবে ফেতনা ছড়িয়ে আছে, কোনো নির্জন স্থান বা গুহায় গিয়েও ঈমানের ওপর থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার জন্য আমরা কিছু বিষয় আবশ্যক করে নিতে পারি।

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।

- নফল ও সুন্নত নামাজের পাবন্দ করা। সুন্নত নামাজের প্রতি গাফলতি এলে ফরজ নামাজেও চলে আসবে। তাই সুন্নতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

- নামাজের পরে মন খুলে দুআ করা। কিছু দুআ এখানে দেওয়া হলো।

শিরক থেকে বাঁচার দুআ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে (শিরক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।[৪]

মুসলিম হিসেবে মৃত্যু চাওয়ার দুয়া

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

অর্থ : হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।[৫]

দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকার দুআ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

অর্থ : হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখুন।[৬]

- প্রতিদিন নিয়ম করে কুরআনের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা। সম্ভব হলে অনুবাদ পড়া।

---

[৪] সহিহ, আল-জামে : ২৩৩।

[৫] সুরা বাকারা : ২৫০

[৬] সহিহ, তিরমিজি : ৩৫২২।

- খুব গুরুত্বের সাথে নজরের হেফাজত করা। বেগানা নারীর সাথে কথা বলা তো দূরের বিষয়। তার দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা। অনলাইন-অফলাইন সব জাগাতেই এটা ফলো করা।

- প্রাথমিকভাবে এই বিষয়গুলো ফলো করলে অন্য বিষয় আস্তে আস্তে আয়ত্তে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়ারের ওপর অবিচল রাখুন। ঈমানের ওপর মৃত্যু নসিব করুন। আমিন।

বোরহান আশরাফী
চেতনা প্রকাশন

প্রথম পর্ব

দ্বীনে ফেরার পর

ডা. শামসুল আরেফীন

দ্বীনে ফেরার পর

দ্বীনে ফেরার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্বীনের ওপর অটল থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেহেরবানি করে আমাকে দ্বীনের যে রাজপথে উঠিয়েছেন সেখান থেকে যেন আমি হারিয়ে না যাই, সেই পথেই যেন চলতে থাকি। ভিন্ন কোনো পথে, ভ্রান্ত কোনো মতে বা সেই রাজপথ ছেড়ে কোনো অলিগলিতে যেন আমি হারিয়ে না যাই। এটা অনেক বেশি জরুরি।

এই দুনিয়ার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান নেয়ামত হচ্ছে হেদায়াত। আর দুর্ভাগা সে, হেদায়াত লাভের পর যে পুনরায় গোমরাহিতে হারিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

> ‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার (ভ্রষ্টতা) থেকে বের করে আলোতে (হেদায়াতের পথে) নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক শয়তান, তারা তাদেরকে আলো (হেদায়াত) থেকে বের করে অন্ধকারে (গোমরাহিতে) নিয়ে যায়। তারা সকলেই অগ্নিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।’[৭]

হেদায়াতের পথ থেকে ছিটকে পড়ার বিভিন্ন রকম দৃশ্যপট হতে পারে। যেমন,

❑ ছোটবেলায় ক্লাস ফাইভ, সিক্সের দিকে আমরা অনেকেই নিয়মিত নামাজ পড়তাম। কিন্তু আরেকটু বড় হয়ে ক্লাস নাইন, টেন বা ইন্টারে এসে অনেকেই নামাজ ছেড়ে দিয়েছি।

❑ আবার অনেকে স্কুল-কলেজে থাকাকালীন দ্বীন-ইসলাম ও নামাজ-রোজার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী থাকলেও ভার্সিটিতে এসে দ্বীন পালনের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি ভার্সিটিতে আসার পরে তার ঈমান নিয়েই সংশয় এসে পড়েছে।

---

[৭] সুরা বাকারা : ২৫৭।

❑ আবার কেউ ভার্সিটিতে এসে হেদায়াত পেয়েছে, ইসলামকে বুঝেছে, ঈমানকে ধারণ করে জীবনযাপন শুরু করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার ক্যারিয়ারের ধাপ শুরু হয়েছে, সে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, বা বিবাহশাদী করে সংসারী হয়েছে; তখন দ্বীনকে ভুলে গেছে।

❑ আরেকটি দৃশ্যপট এরকম হতে পারে, কোনো ব্যক্তি পড়েছে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে, থেকেছে দ্বীনি মানুষজনের সান্নিধ্যে, ইসলাম বিষয়ে তার ভালোমতোই জানাশোনা আছে। কিংবা হতে পারে সে কওমি মাদরাসায় পড়াশোনা করেছে, সেখানে অনেক আল্লাহওয়ালা আলেমদের নেক সোহবত পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভার্সিটিতে এসে পরিবেশের পরিবর্তনে ও পরিস্থিতির বৈরিতায় সে পুরোপুরি দ্বীনকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে— পুরোপুরি সেক্যুলার লাইফস্টাইল ও চিন্তাচেতনাকে আঁকড়ে ধরেছে।

এভাবে হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার নানা রকম দৃশ্যপট হতে পারে, থাকতে পারে বিভিন্ন ধাপ। হেদায়াত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন স্তরও থাকতে পারে।

- যেমন, ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরে ফিরে যাওয়া একটা স্তর। ভার্সিটিতে গিয়ে নাস্তিক হয়ে যাওয়া, সেক্যুলার হয়ে যাওয়া।

- আবার কোনো আমলে অভ্যস্ত হয়ে একসময় গিয়ে তা আবার পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া আরেকটা স্তর। যেমন, কেউ দীর্ঘদিন থেকে তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত, কিন্তু একটা সময় এসে হুট করে এখন আর সে তাহাজ্জুদ পড়ছে না, শুধু ফরজ নামাজগুলোই আদায় করছে। এটাও একধরনের হেদায়াত হারিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আমলের কমতিও হেদায়াত হারিয়ে যাওয়ার একটা স্তর হতে পারে।

- অনুরূপভাবে আমলে নিষ্ঠা ও মনোযোগের ঘাটতি হেদায়াত হারানোর আরেকটা স্তর। যেমন, কেউ আগে অনেক আমল করত, জামাতে হাজির হয়ে খুশু-খুজুর সাথে একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায় করত। কিন্তু এখন আর আগের মতো আমল করতে পারছে না বা তার আর আগের মতো ইচ্ছা জাগছে না, নামাজগুলোও কোনো রকমে ঘরেই আদায় করে নিচ্ছে, জামাতে হাজির হওয়াকেও তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

- হেদায়েত হারিয়ে যাবার একটা ধাপ এমন যে, কেউ আগে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ অনুভব করত, এখন আর তা করছে না। দায়সারাভাবে, বোঝা বহনের মতো করে সে দীনকে পালন করছে। আগে কোনো বোন নেকাব পরা, পর্দা করাকে জরুরি মনে করত, কিন্তু এখন সে শুধু বোরকা পরা বা ওড়নাকে হিজাবের মতো করে পেঁচিয়ে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করছে। আগে কেউ মাহরাম-গায়রে মাহরাম মেনে চলত, এখন আর সে তা মেনে চলছে না। হয়তো-বা এটাকে জরুরিও মনে করছে না। এটাও এটা ধাপ।

মূলত হেদায়াত হারিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে যাওয়া যেমন গোমরাহির শেষ ধাপ, তেমনই মুমিন বান্দার ঈমান-আমলের হালতের অবনতি এবং দ্বীন পালনের উদাসীনতাগুলোও হেদায়াত হারানোর প্রাথমিক ধাপ। এখানে বিভিন্ন দিক থেকে মূল মূল কিছু বিষয়ের আলোচনা করা হবে। সেখান থেকে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে, আমি এর মধ্যে কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছি এবং আমার করণীয় কী হবে!

আগে মানুষ যে পরিমাণ দ্বীনকে ভালোবাসত, দ্বীনের কঠিন কঠিন ব্যাপারগুলোকে সহজে গ্রহণ করত, এখন কিন্তু তেমনটা নেই। মানুষ এখন সহজের সন্ধানে থাকে। ইসলামই মধ্যপন্থা। যে ইসলামকে আমরা কঠিন মনে করছি সেটাকেই আল্লাহ মধ্যপন্থা বলে দিয়েছেন কুরআনে। বর্তমানে খুব চেষ্টা করা হচ্ছে কীভাবে সেই ইসলামের মাঝেও আরও বেশি সহজীকরণ করা যায়। মানে মধ্যপন্থারও মধ্যপন্থা। আগে দেখা যেত একটা ছেলে হস্তমৈথুনকে খারাপ মনে করত, কিন্তু এখন সে এর পক্ষে দলিল খুঁজে বেড়াচ্ছে, এর পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় কি-না। আগে কেউ গান শোনাকে খারাপ মনে করত, এখন সে মিউজিক শোনা যাবে কি-না এর স্বপক্ষে দলিল খোঁজায় মগ্ন। সে বের করার চেষ্টায় আছে যে, অমুক অমুক সাহাবি (রাঃ) নাকি মিউজিক শুনেছেন! অমুক-তমুক সালাফদের থেকে নাকি মিউজিক জায়েজ হওয়া প্রমাণিত আছে! রাতদিন সে এখন এসবের পেছনেই সময় ব্যয় করছে। যেকোনো মূল্যে মিউজিককে তার জায়েজ করতেই হবে। এটা তো সুস্পষ্টভাবেই হেদায়াত থেকে বিচ্যুতি।

এই বিষয়টা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারব, পূর্বে দ্বীনের যে রাজপথে আমরা ছিলাম, যেসকল দ্বীনি কর্মকাণ্ডের সাথে জুড়ে ছিলাম, তা ছিল কুরআন-সুন্নাহর

আলোকে উম্মাতের বৃহদাংশ উলামায়ে কেরামের নির্বাচিত পথ ও মনোনীত পন্থা। সেখানে আমরা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের সাথে তারা দ্বীনের যে পথকে অবলম্বন করেছেন এবং যেভাবে দ্বীনকে ধারণ করেছেন, সেভাবে সেই পথে আমাদের বিচরণ হতো। এখন আমরা একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছি, নিজেকে একটা খাহেশাতের (মনমাফিক কর্মকাণ্ডের) মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছি।

এখন আমরা পূর্ণ হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার কিছু কারণ বিশ্লেষণ করছি। পাঠকরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখবেন যে, কোনোটা আমার সাথে মিলে যাচ্ছে কি-না।

সঠিক দ্বীন না শেখা

বর্তমানে একটা দৃশ্য খুব দেখা যাচ্ছে যে, অনেক ভাই দ্বীনে আসার পর দ্বীনের জরুরি ও বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ না করে মতানৈক্যপূর্ণ বিভিন্ন গভীর বিষয়ে আত্মনিয়োগ করছে। দ্বীনকে সঠিকভাবে জানা ও শেখার পরিবর্তে দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে কিছু তর্ক-বিতর্ক শিখে নেওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এটাকেই দ্বীন মনে করছে। সালাফদের কয়েকটা বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারা আর কিছু যুক্তি কপচানো তর্ক-বিতর্ক শিখতে পারাকেই দ্বীনের মূল বিষয় বানিয়ে নিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি তাবলিগ, আহলে হাদিস, জামাত, সালাফি বা ইসলামি ভাবধারার অন্য যেকোনো ঘরানার মাধ্যমে দ্বীন পালনের স্পৃহা লাভ করল। তো দ্বীনের পথে ফিরে আসা মাত্রই সর্বপ্রথম তার এই বুঝটা অর্জিত হয় যে, 'সে দ্বীনকে যেভাবে বুঝেছে এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়কে যেভাবে জেনেছে, পৃথিবীতে শুধু তার বুঝটাই সঠিক এবং তার জানাটাই একমাত্র নির্ভুল। সে ও তার পছন্দের বিশেষ দলটি ছাড়া পৃথিবীর অপরাপর সকল মুসলমান ভুলের মধ্যে রয়েছে। তারা দ্বীনকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ঈমান-আকিদা ও চেতনা-বিশ্বাস সব ভুল। ফলে তারা সবাই জাহান্নামি হয়ে যাচ্ছে।' সকলের অবস্থাই যে এমন, বা সব ঘরানাতেই যে এভাবে বোঝানো হয়, তা নয়। তবে এমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যে আসলেই রয়েছে, সেটাও অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

এই যে দ্বীনে ফেরার শুরুতেই একজন ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে ভুল ধারণা পাচ্ছে এবং শুরুতেই সে আকিদা ও ফিকহের রাজনীতির দিকে চলে যাচ্ছে, এটা সঠিক দ্বীন না শেখার প্রভাব। মনে করেন, কোনো সালাফি ভাই তাকে আকিদার ক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে আল্লাহ তাআলার আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে সালাফিদের যে বিশেষ ব্যাখ্যা ও মতামত রয়েছে, তা যদি সে মেনে না নেয় তাহলে তার আকিদায় বিভ্রান্তি রয়ে গেল। বা সে জাহমিয়া বিদআতী হয়ে গেল, সুতরাং সে তো জাহান্নামি। অথবা এভাবে বোঝালো যে, সালাফি আকিদা গ্রহণ না করার কারণে সকল হানাফিরা জাহমিয়া ও জাহান্নামি। অনুরূপভাবে আহলে হাদিস কোনো ভাই তাকে বোঝালো যে, মাজহাব অনুসরণ হচ্ছে গোমরাহি। কুরআন-হাদিসের বাহিরে কোনো ইমামের তাকলিদ বলতে কিছু নেই। কিংবা কোনো আহলে কুরআনের খপ্পরে পড়ে সে হাদিসকেই অস্বীকার করে বসল। এভাবে একটা প্রান্তিক চিন্তা ও মতাদর্শকে তার সামনে একমাত্র সহিহ দ্বীন হিসেবে পেশ করার ফলে সে সঠিক দ্বীন ও দ্বীনের সঠিক বুঝ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

রফউল ইয়াদাইন করা, উচ্চৈঃস্বরে আমিন বলা—এগুলো নিয়ে একটা সময় এত বেশি আলোচনা হতো না। আর এখনকার অবস্থা হলো শুধুমাত্র এগুলোকেই অনেকে দ্বীন বানিয়ে নিয়েছে। অতঃপর মসজিদ থেকে নিয়ে চায়ের দোকান পর্যন্ত—সবখানে সে এই তর্কেই ডুবে আছে। কেউ কেউ তো এই বিতর্ককে জিহাদ ভেবে বসে আছে। অনেকে আবার এই তর্ক-বিতর্ককে মনে করছে দ্বীনের মহান দাওয়াত। তাদের দৌরাত্ম্যের দরুন মনে হয় যেন, পুরো দ্বীন ও শরিয়ত বুঝি শুধু মতানৈক্য আর তর্ক-বিতর্ক দিয়েই ভরা। অথচ দ্বীনের অধিকাংশ ও মৌলিক বিষয়গুলোতে কারোরই কোনো ইখতেলাফ (মতানৈক্য) নেই। দ্বীনের যে প্রধান প্রধান ধারাগুলো রয়েছে, সেখানেও দেখবেন দ্বীনের পঁচানব্বই ভাগ বিষয়েই তাদের মাঝে কোনো মতভিন্নতা নেই। এই যে চারপাশে এত এত তর্ক-বিতর্ক দেখা যায়, এই সম্পূর্ণ বিতর্কের ক্ষেত্র হচ্ছে শুধুমাত্র ফিকহ ও আকিদার ফুরুই (শাখাগত) কিছু বিষয়।

একটু ভেবে দেখুন, দ্বীনের মৌলিক রুকন ও মৌলিক আকিদায় কেউ কিন্তু দ্বিমত করছে না। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহিদের বিশ্বাস, নবী-রাসুল ও ফেরেশতাকুলে বিশ্বাস, ভালো-মন্দ তাকদির, পরকাল, পুনরুত্থান, হাশর, মিজান, পুলসিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনো মুসলমানের মাঝেই দ্বিমত নেই। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, গোনাহ বর্জন ও দ্বীন পালন ইত্যাদি আমলি ও আখলাকি

বিষয়াবলি নিয়েও কেউ বিতর্ক করছে না। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সবাই পড়ছে, নামাজে সবাই একটা রুকু ও দুটা সেজদা করছে। রমজান মাসে সবাই রোজা রাখছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে তো কারও মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। দুঃখের বিষয় হলো নতুন দ্বীনে আসা আমরা অধিকাংশ ইসলামের এই মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কেই অজ্ঞ। আমাদের নামাজ-তেলাওয়াত শুদ্ধ না, জাকাত-রোজার বিধানাবলি আমাদের ভালোভাবে জানা নেই, পাক-পবিত্রতার মৌলিক মাসআলাসমূহ পর্যন্ত আমরা পরিপূর্ণভাবে জানি না। এই যে আমরা বিভিন্ন ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, আবার কর্মস্থলে ফিরে আসছি, বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ট্যুরে যাচ্ছি, অথচ পথিমধ্যে মুসাফির অবস্থায় আমাদের নামাজের জন্য জরুরি বিধানসমূহ এখনো আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি, দৈনন্দিন মাসনুন দুআ ও সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন আমলগুলোসহ মতানৈক্যহীন অন্যান্য মৌলিক ও জরুরি বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা বরাবরই বড় উদাসীন। অথচ আমাদের সময় কাটছে দ্বীনের শাখাগত পাঁচ পার্সেন্ট বিষয়ের ওপর কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাকবিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্ক নিয়ে। এটা বড়ই আফসোসের বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি ইসলামের প্রধান ও মৌলিক বিষয়গুলো শেখা থেকেই উদাসীন থেকে গেল।

ঠিক একইভাবে আমরা যারা তাবলিগের মাধ্যমে দ্বীনের পথে এসেছি, আমরা মনে করি তাবলিগ যারা করে না, তারা সবাই ভ্রষ্টতার মাঝে ডুবে আছে এবং জাহান্নামের দিকে ছুটে যাচ্ছে। শুধু আমরা সঠিক আর আমরাই একমাত্র জান্নাতের পথে আছি। এটাও মারাত্মক প্রান্তিকতা ও বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবে দ্বীনের প্রত্যেক ধারাতেই বিদ্যমান এসব প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাড়াবাড়িগুলো বড় ধরনের গোমরাহি ও বিতর্কের জন্মদাতা। দ্বীনে ফেরার পর বদদ্বীনিকে বর্জন করার সাথে সাথে এসব বিভ্রান্তিকর ধ্যান-ধারণাকেও আমাদের পরিহার করতে হবে।

সুতরাং দ্বীনে আসার পর আমাদের প্রথম করণীয় হবে দ্বীন ইসলামের পথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

- মৌলিক ঈমান-আকিদা সম্পর্কে জানা[৮]
- কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ করা

---

[৮] মৌলিক ইসলামি আকিদা জানতে পড়ুন চেতনা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'বুনিয়াদি আকাইদ'।

- নামাজের মৌলিক বিধানসমূহ শেখা
- নিজের ঈমান-আমলকে সুন্দর থেকে সুন্দর করা
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত-সুন্নতের জ্ঞান অর্জন করা
- সুন্নাহর অনুসরণ ও বিদআত বর্জন করা
- আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার তাআল্লুক (সম্পর্ক) উপলব্ধি করতে শেখা
- আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক-মহব্বত দ্বারা স্বীয় কলবকে নুরান্বিত (আলোকিত) করা
- অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়কে জাগ্রত করা, তাকওয়া অবলম্বন করা
- কামাই-রোজগারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের ইলম অর্জন করা
- ইসলাম মানুষের জন্য কেন জরুরি, কেন আমাকে দ্বীন পালন করতে হবে— সে সম্পর্কে জানা।
- বিভিন্ন পশ্চিমা মতাদর্শ এবং সেসবের যে ক্ষতি আমরা আমাদের জীবনে বয়ে বেড়াচ্ছি, সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- নিজেকে দ্বীনের একজন দাঈ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।
- একজন দাঈ হিসেবে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনে ইসলামের গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসলামের বিজয় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা কেন জরুরি, তা জানা ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।

মোটকথা ইসলামের যে মৌলিক বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র উত্তম-অনুত্তম বা মুস্তাহাব পর্যায়ের কিছু মাসায়েল নিয়ে তর্ক-বিতর্কে ডুবে থাকা আজ আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

পরিতাপের বিষয় আর কী বলব, এই উম্মতের মধ্যে বিগত এক হাজার বছরের অধিক সময় ধরে আকিদার কিছু শাখাগত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে চলমান ইলমি (জ্ঞানগত) বিতর্ক আজ সাধারণ মানুষদের চর্চার বিষয় হয়ে গেছে। বর্তমানের বাস্তবতা হচ্ছে, ক্লাস সেভেনে

পড়া একটা ছেলেও দ্বীন পালন করতে শুরু করার পর এমন এমন বিষয়ে গবেষণা করতে নেমে যাচ্ছে, যেগুলো ছিল উম্মতের মুজতাহিদ আলেম ও বড় বড় ফকিহদের গবেষণার বিষয়। হাজার বছরেও যে বিতর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, আজকের কলেজপড়ুয়া দ্বীনি ভাইটি দ্বীনে আসার দ্বিতীয় দিনেই সে বিতর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে পড়ছে। অথচ এসব বিতর্ককে তার স্বস্থানে রেখেই উম্মত পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন অটুট রেখে এতদূর এসে পৌঁছেছে। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ পূর্বে এসব বিষয় নিয়ে তারাই বিতর্কে জড়াত, যারা এর জন্য উপযুক্ত ছিল। আর আজ যখন অযোগ্য, অনুপযুক্ত এমনকি শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে না জানা ও দ্বীনের ব্যাপারে চরম অজ্ঞ ব্যক্তিটি পর্যন্ত এসব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করেছে, তখন অন্ধকার, অজ্ঞতা আর ফেতনা ছড়ানো ছাড়া তা থেকে অন্য কোনো উপকার আসছে না। ফলে শত ভাগে বিভক্ত এই জাতি আরও হাজার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। কেউ কেউ তো দ্বীনই ছেড়ে দিচ্ছে, আবার কেউ প্র্যাকটিসিং থাকলেও তার ঈমান-আমলে ঘাটতি চলে আসছে, সংশয়ে নিপতিত হচ্ছে বহুজন, আর মারাত্মক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে।

নতুন দ্বীনে ফেরা ভাইদের মধ্যে যেহেতু ইলম, আমল ও দ্বীনি পরিপক্কতার যথেষ্ট ঘাটতি থাকে, তাই তারা এসব গভীর ও সূক্ষ্ম বিতর্কে জড়ানোর দ্বারা সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয় তা হলো, একসময় গিয়ে তার মন-মানসিকতায় মারাত্মক প্রান্তিকতা ও উগ্রতা বাসা বাঁধে। দেখা যায়, সে ভিন্নমতের আকাবির-আসলাফদের (পূর্বসূরি উলামায়ে কেরাম) পর্যন্ত গালি-গালাজ করতে শুরু করে। যুগের বড় বড় আলেম-উলামাদের সাথে বেয়াদবিমূলক আচরণ করতে থাকে, এমনকি তাদের অকথ্য ভাষায় গালি দিতেও দ্বিধা করে না। বলাবাহুল্য, এরূপ উগ্র ও প্রান্তিক ব্যক্তি কখনো সত্যের সন্ধান পায় না, এমনকি সে সত্যের ওপর অবিচল থাকার যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে ফেলে। দেখা যায়, এই তর্ক-বিতর্ক তার খাহেশাতে পরিণত হয়ে যায়। তখন সে এই বিতর্ককেই দ্বীনের মূল মনে করে, আর দ্বীনের প্রধান ও মৌলিক বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না সে কখনো শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াতের স্বাদ লাভ করে, আর না কখনো স্থির হয়ে আল্লাহর মারেফতকে উপলব্ধি করার তাওফিক হয়। বরং কখনো তো অবস্থা এমন হয় যে, সে ফরজ নামাজটা পর্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আদায় করতে পারে না। তর্কে জেতার তাড়নায় নিজ পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর নেওয়ার সময়টুকুও পায় না। মনে রাখবেন, এটা দ্বীনের জন্য কুরবানি নয়, বরং এটা

দ্বীন নিয়ে অনধিকার চর্চার শাস্তি, ভিন্নমতের আকাবির-আসলাফ (পূর্বসূরি উলামায়ে কেরাম)-দের গালমন্দ করার কুফল এবং হালজমানার আলেম-উলামাদের সাথে বেয়াদবি করার কু-প্রভাব। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদের সকলকে দ্বীনি বিষয়ে এমন অনধিকার চর্চা ও দ্বীনি খেদমতের নামে দ্বীন নিয়ে তামাশা করা থেকে হেফাজত করেন। আমিন।

দ্বীনের নিয়মতান্ত্রিক ও ট্রাডিশনাল শিক্ষা থেকে দূরে থাকা

এ কথা ধ্রুব সত্য যে, জীবনের একটা দীর্ঘ সময় জেনারেল শিক্ষায় অতিবাহিত করার পর আমরা যারা দ্বীন পালনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি বা প্রচলিত পরিভাষায় ''দ্বীনে ফিরছি', অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও দ্বীনের নিয়মতান্ত্রিক ও ট্রাডিশনাল শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আমাদের হয় না। কেননা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সুনির্দিষ্ট কোনো উস্তাদের নিকট থেকে ট্রাডিশনালি দ্বীন শেখার পেছনে সময় দেওয়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। আজ আমরা যতটুকুই শিখছি তা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন উস্তাদ থেকে কয়েকটা দরস করার মাধ্যমে, বা সময়ে সময়ে বিভিন্নজন থেকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়ার মাধ্যমে, বিভিন্ন শায়খ ও আলেমদের ভিডিও লেকচার থেকে, দ্বীনের নানা বিষয়ে লিখিত আর্টিকেলগুলো পড়ার মাধ্যমে, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত-অনূদিত ইসলামি বইপত্র অধ্যয়ন করার দ্বারা, অথবা নিজস্ব অভিরুচি ও ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। বলাবাহুল্য, এর কোনোটাই দ্বীন শেখার নিয়মতান্ত্রিক ও ট্রাডিশনাল কোনো ধারা নয়। একে নিরবচ্ছিন্ন ইলমসাধনাও বলা যায় না। ফলে এই পদ্ধতিতে আমরা অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে সক্ষম হলেও আমাদের মাঝে দ্বীন ও শরিয়তের ঐতিহ্যগত মেজাজ ও অভিরুচি তৈরি হচ্ছে না। নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক ইলমসাধনার অভাবে আমাদের চিন্তাধারা ও রুচি-প্রকৃতিতেও বিক্ষিপ্ততা থেকে যাচ্ছে। যার ফলে দ্বীনের অনেক কিছুই আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। বিশেষত দ্বীন ও শরিয়তের ব্যাপারে আমাদের আবেগ-অনুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয় না। যে ছেলেটা কোনো পরিবারিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বড় হয়, আর যে ছেলে পারিবারবিহীন পথেঘাটে বেড়ে ওঠে, সামাজিকভাবে ও ব্যক্তিজীবনে উভয়ের চিন্তা-চেতনা ও আবেগ-অনুভূতি কখনো একরকম হবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা যেন পথে-ঘাটে বড় হওয়া ছেলেটার মতোই। হয়তো আমাদের কারও দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে অনেক ইলম জমা করাও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু

নিয়মতান্ত্রিকতা ও ঐতিহ্যগত পরিচর্যার অভাবে তার চিন্তাধারা, দ্বীনি আবেগ-অনুভূতি ও অভিরুচির মাঝে বড় ধরনের একটা শূন্যতা থেকেই যাবে। বিক্ষিপ্ত অধ্যাবসায় ও বিচ্ছিন্ন সাধনা দ্বারা যে শূন্যতা সে কখনো পূরণ করতে সক্ষম হবে না। এখানেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে উস্তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ইলম অর্জন ও শুয়ে-বসে, হেলে-দুলে সংগ্রহ করা ইলমের মাঝে বিস্তর ব্যবধান।

দ্বীনের নিয়মতান্ত্রিক ও ট্রাডিশনাল শিক্ষা না থাকার কারণে ব্যক্তি অনেক নেয়ামত থেকেই বঞ্চিত হয়। যেমন,

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে বান্দার সম্পর্কের যে একটা অনুভূতি রয়েছে, দ্বীনের মাঝে যে অন্তর্নিহিত আবেগ লুক্কায়িত আছে, সে তা উপভোগ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক (তাআল্লুক মাআল্লাহ)-এর স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হয়। সারাক্ষণ তাত্ত্বিক জ্ঞান কপচানো, তর্ক-বিতর্কে ডুবে যাওয়া, সহিহ-যইফ নিয়ে পড়ে থাকা ও দলিল-আদিল্লা নিয়ে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকার দরুন দ্বীনের এসব সরস ও মধুময় বিষয় নিয়ে ভাবার এবং সেদিকে মনোনিবেশ করার সময়-সুযোগই তার হয় না। স্বাভাবিকভাবেই দেখুন, যদি আমরা সব সময় কেবল দলিলের তাত্ত্বিক কাঠখোট্টা আবরণের ওপরই পড়ে থাকি, তাহলে দলিলের অভ্যন্তরে নিহিত আবেগ ও আবেদনকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হব। উদাহরণস্বরূপ , আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে চুরির বিধান বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

‘যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় (এবং) আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[৯]

একটু খেয়াল করে দেখুন, এখানে বিধান বর্ণনার পর আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের দুটি গুণবাচক নাম আযিযুন, হাকিমুন উল্লেখ করেছেন। এভাবে পবিত্র কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা কোনো বিধান বলার পর সেখানে নিজের কোনো গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এর মাঝে আল্লাহ তাআলার কোনো না কোনো হেকমত বা বিশেষ কোনো বার্তা নিহিত থাকে। যেমন, উল্লিখিত

---

[৯] সুরা মায়েদা : ৩৮।

আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় গুণবাচক নামদুটি দ্বারা আমাদের এই বার্তা দিলেন যে, আল্লাহ তাআলার ওপর কেউ ক্ষমতাবান নয়। বরং তিনি নিজেই পরাক্রমশালী। সুতরাং এই বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। তিনি নিজ ইচ্ছামতো বিধান আরোপ করেন। তবে তাঁর দেওয়া বিধানের মাঝে নিহিত রয়েছে প্রভূত হেকমত ও মহা প্রজ্ঞা। কেননা তিনি তো হাকিম (মহা প্রজ্ঞাবান)। অর্থাৎ, স্বীয় প্রজ্ঞার দাবি থেকেই তিনি আমাদের এই বিধান দিয়েছেন। সুতরাং একে উপেক্ষা করে বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়ে নিজেদের মনগড়া কোনো নিয়মনীতির মধ্যে আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ নেই। চাই আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তা বুঝে আসুক বা না-ই আসুক।

অনুরূপভাবে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

> 'অতঃপর আমি সেই শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করি। এরপর সেই জমাট রক্তকে গোশতপিণ্ড বানিয়ে দিই। তারপর সেই গোশতপিণ্ডকে অস্থিতে রূপান্তরিত করি। তারপর অস্থিরাজিতে গোশতের আচ্ছাদন লাগিয়ে দিই। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান!'[১০]

লক্ষ করুন, এখানে আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনার পর বলেছেন,

﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

'বস্তুত সকল কারিগরের শ্রেষ্ঠ কারিগর আল্লাহ কত মহান!'[১১]

অর্থাৎ, এখানে আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করি। তাহলে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা চিনতে পারব এবং আমাদের এই অনুভূতি জাগ্রত

---

[১০] সুরা মুমিনুন : ১৪।
[১১] সুরা মুমিনুন : ১৪

হবে যে, আল্লাহ তাআলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-কারিগর আর হতে পারে না। তিনি সুমহান, সুউচ্চ ও অনন্য।

এভাবে আমাদের উচিত ছিল দলিল পর্যালোচনার সাথে সাথে প্রতিটি দলিলের মাঝে নিহিত আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মারেফতকে খুঁজে নেওয়া, তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা, সর্বোপরি রব্বে কারিমের পরিচয়কে অন্তর দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করা। কিন্তু বড়ই দুঃখজনক যে, আমরা শুধু দলিলের বাহ্যিক পর্যালোচনার মাঝেই আটকে আছি, আক্ষরিক দিক থেকে দলিলের চুলচেরা বিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে আছি, কিন্তু অক্ষরের অভ্যন্তরে নিহিত থাকা গভীর তাৎপর্য ও আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সুমহান মাহাত্ম্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছি না। দলিল-আদিল্লার বাহ্যিক দিক নিয়ে বাকবিতণ্ডা করতে করতে রবের সাথে আমাদের যে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন ছিল, সেই অনুভূতিই আজ আমাদের থেকে বিলীন হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে দলিল-প্রমাণ ও দলিলের তাত্ত্বিকতার প্রয়োজনীয়তা একটা অনস্বীকার্য বিষয়। তবে এর সাথে সাথে দলিলের অভ্যন্তরেও ডুব দিতে হবে। বস্তুত দলিলসমূহ যদিও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায়, দলিলের অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি ও আল্লাহ তাআলার মারেফতের অনুভূতি কখনো অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কিছু বিষয় তো অন্তর দিয়েই অনুধাবন করতে হয়। ইন্দ্রিয়শক্তি সেখানে কোনো কাজেরই নয়। আল্লাহ আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন।

মূলত দ্বীন শেখার নিয়মতান্ত্রিক ও ট্রাডিশনাল ধারা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে নসের মাঝে (মূলপাঠে) বিদ্যমান গভীর তাৎপর্য ও সুমহান মাহাত্ম্যকে অনুধাবন করার মতো যথেষ্ট ও উপযুক্ত আবেগ-অনুভূতিই আমাদের মাঝে বিকশিত হয় না। তা ছাড়া দ্বীনে ফেরার পর শুধুমাত্র তত্ত্ব-তালাশ ও দলিল-আদিল্লা নিয়ে সারাক্ষণ বাকবিতণ্ডায় মত্ত থাকার ফলে দ্বীনের মূল রুহ ও রুহানিয়তের সেই মূল্যবান অনুভূতিকেই আমরা হারিয়ে ফেলি। অবশ্য এর পেছনে কিছুসংখ্যক প্রসিদ্ধ শায়খ ও দ্বীনি ভাইদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তারা তাসাউফ তথা ইলমুস সুলুক, তাআল্লুক মাআল্লাহ, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের মারেফত প্রভৃতি বিষয়গুলোকে এত বেশি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, যার ফলে আমাদের অন্তরে এ কথা বসে গেছে যে, দুনিয়ার কোথাও বুঝি তাসাউফ বলতে সঠিক কিছু নেই।

এটা ঠিক যে, বিভিন্ন ভণ্ডবাবা ও দরবারি পীররা তাসাউফের অপব্যবহার করেছে। তারা তাসাউফ চর্চার নামে নানাবিধ অনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু

পৃথিবীর বুকে এখনো এমন অনেক বুজুর্গানে দ্বীন রয়েছেন, যারা আজকের দিন পর্যন্ত তাসাউফের সঠিক চর্চা ও যথাযথ অনুশীলনকে ধরে রেখেছেন। তারা ঘোষণা দিয়েই মানুষকে তরবিয়ত করছেন, মানুষকে দ্বীনের সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করছেন, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিচ্ছেন। তবে আমাদের আশপাশের অনেকেই এই বিষয়গুলোকে খারাপভাবে প্রকাশ করে এবং মানুষকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকে। যার ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ইসলামে ছিল, তা থেকেই আজ আমরা বঞ্চিত হতে চলেছি। তাই সময় হয়েছে এসব আক্ষরিক বাকবিতণ্ডা পরিহার করে আধ্যাত্মিকতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার। একটা কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন, হয়তো তত্ত্ব-তালাশ ও দলিল-আদিল্লা বিশ্লেষণের এই লড়াইয়ে কেউ পরাজিত বা ক্লান্ত হয়ে দ্বীন থেকে সরে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টিকে জীবনে একবারের জন্য হলেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, সে কখনো দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে না। সে তো সর্বক্ষণ ইবাদতের সেই স্বাদ ও মিষ্টতা পাওয়ার জন্যই উদগ্রীব হয়ে থাকবে। এক নামাজের পর অস্থির হয়ে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করবে। সুতরাং দ্বীন ইসলামের অনুভূতিগ্রাহ্য ও আবেগীয় এই বিষয়গুলোকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বরং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

ইসলাম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান কম তাদের জন্যে করণীয়

প্রথমত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে হবে। এরপর বিস্তারিতভাবে ইসলামের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানার্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। শুরুতেই মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের পেছনে পড়লে সেটা হবে ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ। মতানৈক্যের বিষয়গুলোও আস্থাশীল আলেমদের থেকে বুঝে নিতে হবে। নিজে নিজে অধ্যয়ন শুরু করলেই বিপদ। কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ করতে হবে সবার আগে। তারপর মৌলিক আকিদা-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে হবে। এরপর তহারাত-পবিত্রতা, নামাজ-রোজা থেকে শুরু করে অন্যান্য ইবাদত সম্পর্কে জানার পরিধিকে বাড়াতে হবে। সর্বাবস্থায় নির্ভরযোগ্য আলেমদের সাহচর্যকে নিজের জন্য জরুরি মনে করতে হবে।

বেয়াদবি করা

বেয়াদবির দিকটা আমরা চারটি পয়েন্টে আলোচনা করব।

ক. আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবি

অনেক সময় আমাদের অজান্তেই আমরা এমন কিছু বলে ফেলি, যা আল্লাহ তাআলার শানের বিপরীতে চলে যায়।

- যেমন, অনেকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তার বিপদের ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে এভাবে বলে ফেলে যে, 'এমন একটা সমস্যায় পড়েছি, যেটা আল্লাহও সমাধান করতে পারবে না।'

- এমন কথাও আমরা খুব শুনতে পাই যে, 'ওপরে আল্লাহ নিচে তুমি!'

- অনেক সময় কারও জেদি স্বভাবকে বোঝানোর জন্য এভাবে বলতে শোনা যায়, 'খোদা নেমে আসলেও সে আর থামবে না!'

- অনেক মানুষ এমন আছে, যাদের সামান্য কোনো বিপদ-আপদ হলেই বলে বসে, 'আল্লাহ কি আমাকে ছাড়া আর কাউকেই পেল না? এত বড় জুলুম আল্লাহ তুমি আমার ওপর কীভাবে করলে?'

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও দেখা যায় যে, কোনো কারণে পরীক্ষা খারাপ হলে সে জন্য আল্লাহকে দায়ী করতে থাকে। পরীক্ষার আগে কিছুদিন খুব নামাজ-ইবাদত করে, আবার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই সব ছেড়ে দেয়। মূলত ইলমের স্বল্পতা ও বিবেকের অসচেতনতায় এ ধরনের অনেক কথাই আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এর দ্বারা যে আমাদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দৃষ্টি আমাদের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে, সেদিকে আমাদের খেয়াল যায় না। অথচ হাদিস শরিফে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

'নিশ্চয়ই বান্দা কখনো এমন কথা বলে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার গুরুত্ব জানে না। আল্লাহ এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা এমন কথা বলে ফেলে, যাতে

আল্লাহর অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। অথচ সে তার অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয়। আর এ কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।'[১২]

হাদিস থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অসচেতনতাকে ওজর হিসেবে গ্রহণ করা হবে না। বরং অসচেতনভাবে বলা কথার কারণেও বান্দা জাহান্নামি হবে।

খ. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি

সাধারণত সজ্ঞানে কোনো মুসলমান নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবি করার বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও নিজের অজান্তেই আমাদের থেকে এমন কিছু প্রকাশ পেয়ে যায়, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবির শামিল।

- যেমন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে 'বিশেষ ভাবে' জীবিত আছেন কি না, এটা একটা মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা। এর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হতে পারে। যারা এ ব্যাপারে কথা বলার যোগ্য, মতামত দেওয়ার উপযুক্ত, তারা কথা বলবেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে একজনকে দেখা গেল, তিনি জীবিত থাকার বিপক্ষে বলতে গিয়ে এ রকম বলছেন যে, 'কবরে যে নবী জীবিত সেই নবীর সাথে তিন তালাক।' মাআযাল্লাহ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এ রকম বক্তব্য তো মানানসই না।

- আবার অনেককে দেখা যায়, রফউল ইয়াদাইন বা উচ্চৈঃস্বরে আমিন বলার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি ও স্বর বিকৃত করে বিষয়টাকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা ফেয়েল (কর্ম) নিয়ে এভাবে তামাশা করা তো ঠিক না।

- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সবচেয়ে বেশি যে বেয়াদবিটা আমাদের হয়ে থাকে তা হলো, নবীজির সুন্নত নিয়ে হঠকারিতা করা। কোনো যুবক নতুন দাড়ি রাখলে তাকে আমরা নানাভাবে তিরস্কার করতে থাকি। কেউ সুন্নতি পোশাক পাঞ্জাবি, জুব্বা, টুপি পরতে শুরু করলেও তাকে নিয়ে নানা রকম হাসি-তামাশা শুরু হয়ে যায়। পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া, খাওয়ার

---

[১২] সহিহ বুখারি : ৬৪৭৮।

শেষে বর্তন পরিষ্কার করে খাওয়া ইত্যাদি সুন্নতগুলোকে তো আমরা দ্বীনদার শ্রেণিরাও অনেক সময় উপেক্ষা করে যাই।

তত্ত্বনির্ভরশীল আমাদের কাঠখোট্টা মেজাজ আজ ইশকে নবী ও হুব্বে রাসুলের স্বাদ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। একটা কথা মনে রাখবেন, কারও সম্মান ও মর্যাদাকে মস্তিষ্ক দিয়ে বোঝা আর অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মানো কখনো এক হতে পারে না। যাইহোক, বলছিলাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের সাথে পরিহাস করে আমরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই বেয়াদবি করে ফেলছি। সুতরাং নবীজির সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ে আমাদের খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

গ. আলেমদের সাথে বেয়াদবি

একটা সময় ছিল যখন সমাজের চরম উগ্র ও মূর্খ শ্রেণির লোকেরাই আলেমদের সাথে সরাসরি বা প্রকাশ্যে বেয়াদবি করত। এর বাইরে পকেটের গরম ও ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে বেড়ানো কিছুসংখ্যক লোক এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ লালনকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে সচরাচর আলেমদের সাথে বেয়াদবি করতে দেখা যেত না। বরং নবীদের উত্তরসূরি ও দ্বীনের রাহবার হিসেবে সবাই আলেমদের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করত। কিন্তু এখন এমন একটা সময় আমরা অতিবাহিত করছি, যখন প্র্যাকটিসিং, ননপ্র্যাকটিসিং, সাধারণ, বিশেষ, দ্বীনদার, বদদ্বীন—সকলেই আলেমদের সমালোচনা ও তাদের সাথে বেয়াদবিতে লিপ্ত, শুধু ভিন্নমত ও ভিন্ন ঘরানার আলেম হলেই হচ্ছে।

দুঃখের কথা আর কী বলব, চারদিন হয়নি দ্বীনে ফিরেছে এমন যুবকও অকপটে আলমদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই বলে দিচ্ছে। আজকের দ্বীনে ফেরা যুবকরা তো সংঘবদ্ধ হয়ে আলেমদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হচ্ছে। আলেমদের হেয় করার জন্য সংঘবদ্ধ প্লাটফর্ম গড়ে তুলছে। এমনকি তারা বেয়াদবি ও উগ্রতার চরম মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। শুধু হাল যুগের আলেমরাই নয়, বরং পূর্বসূরি মহান মনীষী ও ফকিহ-মুজতাহিদগণ পর্যন্ত তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। স্বীয় মত ও জেদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভিন্নমতের আকাবির-আসলাফদের গালিগালাজ করতেও ছাড়ছে না। দেখুন, আমি কোনো নির্দিষ্ট পক্ষকে দায়ী করছি না। বরং সব পক্ষ ও সব দলের সদস্যরাই এখন বিপরীত দলের আলেমদের প্রতি চরম উগ্রতা দেখাচ্ছে।

আমার কথা হলো, এই তর্ক-বিতর্ক যখন দ্বীনি কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করেই হচ্ছে, তখন তা নিয়ে কথা বলার ও মত প্রকাশের উপযুক্ত ব্যক্তিরাই শুধু কথা বলুক। আমার মতো সাধারণ শিক্ষিত একজন জেনারেল ছেলে যে কিনা এখন পর্যন্ত শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াতটাই শিখতে পারেনি, সে কেন এসব বিষয়ে মতামত দেবে? দ্বীনে ফেরা জেনারেল ভাইরা কেন এগুলোকে নিজেদের আলোচনার বিষয়বস্তু বানাবে? তারা তো আলেমদের থেকে শিখবে, তাদের দ্বারা উপকৃত হবে, নিজে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার জন্য তাদের থেকে দুআ কামনা করবে, অন্তর থেকে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করবে, তাদের দিকনির্দেশনার অনুসরণ করবে। উম্মতের মধ্যে দ্বীন মানা সাধারণ সদস্যরাই যদি উম্মতের আলেমদের সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে যায়, তাহলে এই উম্মতের কী বেহাল দশা হবে তা তো সহজেই অনুমেয়।

হ্যাঁ, হতে পারে আমি একটা বিশেষ ঘরানা, দল, মত বা কোনো নির্দিষ্ট মাজহাবকে অনুসরণ করি। সে ক্ষেত্রে আমি যে মাজহাব বা মতের অনুসারী সেই মত ও মাজহাবের মধ্যেও তো বহু উলামায়ে কেরাম রয়েছেন। তাহলে এসব মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে আমি আমার পক্ষের বা পছন্দের আলেমদের অনুসরণ করলেই তো হচ্ছে। আমাকে কেন ভিন্নমতের আলেমদের গালিগালাজ করতে হবে? তাদের সাথে বাদানুবাদে জড়াতে হবে? এ আবার কেমন দ্বীন পালন?

এখতেলাফ (মতপার্থক্য) থাকলে সেটা আলেমদের মাঝে থাকবে। সকল পক্ষের স্কলাররা সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক যা করা লাগে করবেন। দুদিন ধরে দ্বীনে ফিরে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জনের পেছনে সময় না দিয়ে আমি কেন এসব শাস্ত্রীয় গভীর আলোচনায় আত্মনিয়োগ করব? এটা কি আমার দ্বীন পালন নাকি দ্বীনচর্চার নামে স্বীয় নফসের খাহেশাত পূরণ? তবে কি আমি উম্মতের আলেমদেরকে ইলমি সমস্যাগুলোর সমাধান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করছি না? আমি কি আমার পক্ষের আলেমদের বিবৃতিতে সন্তুষ্ট নই? আমার পক্ষের আলেমরাও কথা বলছেন, তাহলে আবার আমি নিজেও কেন আগ বাড়িয়ে এসে জটলা পাকাচ্ছি?

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আজকের যুবকদের এসব উপদেশও দেওয়া যায় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যক্তিরা কথা বলবেন—এটা তো স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু আজকের যুবকদের যদি বলা হয় ইলমি বিষয়গুলো আলেমদের ওপর ছাড়ো, তারা বলতে শুরু করে ইসলামকে কি পোপতন্ত্র বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন নাকি?

আলেমরা ছাড়া অন্য কেউ কিছু বলতে পারবে না—এ কেমন পোপতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন আপনারা?

কিন্তু এদেরকে কে বোঝাবে যে, কথা বলা তো নিষেধ না; কিন্তু সবারই তো কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট টপিক, ক্ষেত্র বা সীমা-পরিসীমা রয়েছে। আলেমরা কি চাইলেই দ্বীনের মধ্যে নিজেদের মনগড়া কিছু যুক্ত করতে পারবেন? সে অধিকার কি তাদের আছে? তাহলে এটা পোপতন্ত্র হয় কী করে? ইলম অর্জনের নিয়মতান্ত্রিক ও ট্রাডিশনাল ধারা অনুসরণ করে সহিহ পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করে যেকোনো গোত্র বা যেকোনো শ্রেণির লোকের জন্যই এখানে আলেমের তালিকায় নাম লেখানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, দ্বীনের শাস্ত্রীয় ও উসুলি বিষয়ে যে কেউ এসে যা খুশি বলে দেবে। দ্বীন ইসলামে পোপতন্ত্র নাই ঠিক, কিন্তু এই দ্বীন ও শরিয়ত এতটাও কাঙাল হয়ে যায়নি যে, ওজু-ইস্তেঞ্জা ও পাক-পবিত্রতার বিধানসমূহ ঠিকভাবে না জানা লোক থেকে দ্বীনের শাস্ত্রীয় মতানৈক্যের সমাধান নিতে হবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

> ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, তাঁর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারাধারী তাদের।’[১৩]

সেদিনের দ্বীনে ফেরা এই জেনারেল যুবক, যার নিয়মতান্ত্রিকভাবে দ্বীন সম্পর্কে জানার ও বোঝার সুযোগই হয়নি, শুধুমাত্র কিছু তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করেই সে আবার কবে থেকে এই এখতিয়ার পেয়ে গেল যে, দ্বীনের শাস্ত্রীয় ও উসুলি বিষয়ে সে দ্বীনের শাস্ত্রীয় ব্যক্তিবর্গের সাথেই বিতর্কে অবতীর্ণ হয়? সে এই অনুমতি কোথায় পেল যে, সে উম্মতের স্বীকৃত মহান মনীষীদের গালমন্দ করে? দ্বীন মানার আগের হুঁচড়েপাকা কি তবে দ্বীনে এসেও হুঁচড়েপাকাই রয়ে গেল? সে কি নিজের মন-মগজ ও স্বভাব-প্রকৃতিকে দ্বীনের রঙে রাঙাবে না? ভার্সিটির সিনিয়রদের যতটুকু সম্মান তারা দিত দ্বীনে এসে ক্ষেত্রবিশেষে দ্বীনের আলেমদেরকে ততটুকু সম্মানও যেন তারা দিতে নারাজ। এ কেমন আশ্চর্য দৃশ্য?

হয়তো আমি একটু বেশি কড়া করে বলে ফেললাম। সে জন্য দুঃখিত। কিন্তু দেখুন, বিষয়টা আসলে কড়া করে বলার মতোই। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে

---

[১৩] সুরা নিসা : ৫৯।

পারবেন এর পেছনের সমস্যাটা কত ভয়াবহ। মনে করুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময় ব্যয় করে, বিভিন্ন জনের থেকে ইলম আহরণ করে, কিংবা অনেক অনেক দ্বীনি বইপত্র অধ্যয়ন করে দশ-বারোটা মাসআলার ওপর প্রচুর পরিমাণ তথ্য ও তত্ত্ব বা যুক্তি-দর্শন একত্রিত করলাম। কিন্তু এর দ্বারা কি দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক ও জরুরি শাখা-প্রশাখার ওপর আমার ইলম অর্জিত হয়ে গেছে? মৌলিকভাবে কি আমি একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন দ্বীনি সমস্যাগুলোর শরঈ সমাধান দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি? তাহলে এই দশ-বারোটা তর্কের টপিকে মোটামুটি ভালোভাবে জানার ওপর ভিত্তি করে আমি যে আলেমদের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হচ্ছি, সাধারণ মানুষদের আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছি, আমি কি এই মানুষগুলোর অন্যান্য শরঈ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম? নাকি অন্যান্য বিষয়ের সমাধানের জন্য তাদেরকে আলেমদের শরণাপন্নই হতে হবে? এখন আমার এত বেশি উচ্চবাচ্যের কারণে যদি এই মানুষগুলো আলেমদের থেকে দূরে সরে যায় এবং এর ফলে তাদের দৈনন্দিন হাজারো দ্বীনি সমস্যাগুলোর সমাধান জানা ছাড়াই তারা জীবন অতিবাহিত করে থাকে, তাহলে এই বাকি বিষয়গুলোতে তাদের দ্বীনবিমুখতার জন্য দায়ী হবে কে? এর দায় কি আমার ওপর বর্তাবে না? তাহলে দুই-চারটা মাসআলার ওপর কিছু জানাশোনার গরমে আমি পুরো উম্মতকে উম্মতের আলেমদের থেকে বিমুখ করছি কেন? এটা তো সহজ কথা যে, কোনো বিষয়ের বিজ্ঞজনদের থেকে বিমুখ হয়ে সেই বিষয়ে সঠিক অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব না। তাহলে বুঝুন, অনলাইনের আজকের এসব সস্তা বিতর্কের পরিণাম কতটা মারাত্মক হতে চলেছে।

বলতে পারেন, আজকাল অনেক আলেমরাও তো বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। উম্মতকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, আপনার যদি কোনো বিষয়ে কোনো আলেমের একটিভিটি এমন মনে হয়ে থাকে, তাহলে আপনি সম্ভব হলে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি সেই আলেমের সাথেই কথা বলুন। অবশ্যই যথাযথ আদব ও ইহতিরাম বজায় রেখে। দেখা যাবে আপনি হয়তো নিজের জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করে বিষয়টিকে ভুল মনে করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার পর তিনি আপনাকে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন। কেননা অনেক সময় বাহির থেকে অনেকের অনেক অবস্থানই, স্বীয় জ্ঞানের স্বল্পতা বা অন্য অনেক কারণে দেখতে ভুল দেখায়। তো আমি ভুল দেখছি বলেই যে বিষয়টা ভুল হয়ে যাবে, এটা তো জরুরি না। তাই প্রথমে সরাসরি উক্ত আলেমের সাথে আলোচনা করুন। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই বিষয়ে নিজ ঘরানার বা

সেই ঘরানার অপরাপর আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তখন তারাও যদি সেটাকে সঠিক হিসেবেই দেখে তাহলে তো বোঝা গেল যে, আপনার ভুল মনে করাটাই ভুল ছিল। আর যদি অন্যান্য আলেমগণও উক্ত আলেমের সেই একটিভিটি বা অবস্থানকে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেন, তাহলে সেটার সংশোধনী আহ্বান বা সেই বিষয়ে করণীয় পদক্ষেপগুলো অপরাপর আলেমদেরকেই গ্রহণ করতে দিন। আপনার দায়িত্ব ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আপনি সেটা করেছেন। এখন তা সংশোধন করা বা তার সমালোচনা-পর্যালোচনা করার দায়িত্ব তো আর আপনার না। তাহলে আপনি কেন সেটা নিয়ে বাজার গরম করে নিজের দ্বীন বরবাদ করবেন? এই সহজ বিষয়টুকু আল্লাহ আমাদের সহজে বোঝার তাওফিক দান করুন। সাধারণ হয়ে আলেমদের সাথে বাদানুবাদে জড়ানোর ফেতনা থেকে আল্লাহ আমাদের পরিপূর্ণ হেফাজত করুন। আমাদের অন্তরে উম্মতের আলেমদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দান করুন। আমিন।

ঘ. মুমিন-মুসলমানদের সাথে বেয়াদবি

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে সম্মানিত করেছে। ইসলামে কারও ইজ্জত-সম্মানের ওপর আঘাত করার অনুমতি কাউকেই দেওয়া হয়নি। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

‘একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোনো ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে।’[১৪]

হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হয়েছে,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.

‘যে লোক আমাদের শিশুদের আদর করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’[১৫]

---

[১৪] সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৮২।

[১৫] সুনানুত তিরমিজি : ১৯১৯।

এক বর্ণনায় এসেছে,

وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا.

‘এবং আমাদের বড়দের অধিকারের পরোয়া করে না (সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়)।’[১৬]

সুতরাং সর্বাবস্থায় অপর মুসলিমের ইজ্জত-সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। আমার দ্বারা যাতে কোনো মুসলমানের মানহানি না হয়। কারও সাথে কোনো বিষয়ে আমার মতানৈক্য থাকতে পারে। দ্বীন বা দুনিয়াবি কোনো বিষয়ে আমি কারও সাথে দ্বিমত করতেই পারি। কিন্তু এই দ্বিমত যেন বিদ্বেষে পরিণত না হয়। আজকাল ফেইসবুকের কল্যাণে খুব সহজেই যে কেউ যে কারও প্রোফাইলে ঢুকে যেতে পারছে। যে কারও লেখায় কমেন্ট বা মন্তব্য করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এমন এমন ছেলেপুলেদের এমন এমন সম্মানিত ব্যক্তির সাথে গিয়ে তর্কে জড়িয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে যে, এসব দেখে কপালে হাত রেখে আফসোস করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকছে না। আজকের অনলাইনের পরিবেশ হচ্ছে সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয়ে পরস্পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও কটাক্ষ করে কথা বলছে। বড়-ছোট, সিনিয়র-জুনিয়রের কোনো তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। যার ফ্যান-ফলোয়ার বেশি সে-ই হয়ে যাচ্ছে বড়। পক্ষান্তরে ইলম, আমল ও বয়সে বড় ব্যক্তিটিও হয়ে যাচ্ছে অতি ক্ষুদ্র।

যে যাকে যেভাবে পারছে যাচ্ছেতাই ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে। বড় বড় আলেমদের নাম বিকৃতি করে, তাদের বক্তব্যকে উপহাস করে নানা রকমের মিম বানানো হচ্ছে। যাকেতাকে ইহুদিদের দালাল, পশ্চিমাদের এজেন্ট বানিয়ে দিচ্ছে। চুন থেকে পান না খসতেই তেড়ে আসছে গালির বান। অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, কারও জবান থেকে কেউ নিরাপদ নয়। ছোটরা হামলে পড়ছে বড়দের ওপর, বড়রা আকাশ থেকে পাতালে ছুঁড়ে মারছে ছোটদের। কারও প্রতি কারও ভক্তি-শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা, দরদ-ভালোবাসা বলতে কিছুই যেন নেই। অথচ এই হাদিস তো সকলেরই জানা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

‘সে-ই প্রকৃত মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।’[১৭]

১৬] আদাবুল মুফরাদ : ৩৬৪।

আজকে মুঠোফোনের পর্দায় যাদের জবান থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকতে পারছে না, আমার মনে হয় না কখনো তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তাদের হাত থেকেও অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকতে পারবে। এখন তো পূর্ববর্তী মুমিনরা পর্যন্ত আমাদের জবান থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। সাধারণদের কথা তো বাদই, পূর্বসূরি আকাবির-আসলাফদের পর্যন্ত গালমন্দ করতে ছাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মন থেকেই এই দুআ বেশি বেশি করা উচিত,

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

‘হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।’[১৮]

ভার্সিটির পরিবেশ

ভার্সিটির রঙিন পরিবেশের ধোঁকায় পড়েও দ্বীনে ফেরা অনেক তরুণ-তরুণী হেদায়াত হারিয়ে ফেলে। যেমন, কেউ হয়তো মাদরাসা লাইনে জালালাইন-মিশকাত পর্যন্ত পড়েছে। তখন তার চেহারায় দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি-পায়জামা, মাথায় টুপি—সবকিছু ঠিকঠাকমতোই ছিল। পুরোপুরি সুন্নতমাফিক তার জীবন পরিচালিত হচ্ছিল। এরপরে সে কোনোভাবে এস.এস.সি, ইন্টার পরীক্ষা দিয়ে কোনো ভার্সিটিতে এসে ভর্তি হলো। ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর সেখানকার রঙিন পরিবেশ দেখে মনের অজান্তেই সে বদলাতে শুরু করে। তার কাছে মনে হয়, এ দেখি বড় রঙিন ও আজব এক দুনিয়া। এখানে ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়ছে, ক্লাস করছে, আড্ডা দিচ্ছে, কত মজা করছে, ট্যুরে যাচ্ছে, পিকনিকে যাচ্ছে, গ্রুপ স্টাডি করছে। এ রকম একটা পরিবেশে সে নিজেকে বেমানান দেখতে পায়। তার কাছে মনে হয় এই দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি-জুব্বা তো এ পরিবেশের সাথে যায় না। কিছুদিন যাওয়ার পর কোনো এক মেয়েকে পছন্দও হয়ে যেতে পারে। তখন সে ভাবে, ভার্সিটির পরিবেশে চলাফেরা করা এই মেয়ে

---

[১৭] সহিহ বুখারি : ১০।

[১৮] সুরা হাশর : ১০।

তো তার দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি এগুলো পছন্দ করবে না। ফলে ধীরে ধীরে তার পাঞ্জাবি-পায়জামার জায়গায় শার্ট, প্যান্ট, জিন্সের আবির্ভাব হয়। টুপি যে কখন বিলুপ্ত হয়ে যায় তা হয়তো সে নিজেও টের পায় না। সুন্নতসম্মত চুলের বদলে তখন নানা স্টাইলের কাটিং দেখা যাবে। দাড়িও আর আগের মতো থাকবে না। কেটেছেঁটে ছোট করে কিছুটা ভার্সিটির পরিবেশবান্ধব করা হবে। মোটামুটি স্টাইলিশ একটা লুক আসবে চেহারায়। কারও বেলায় তো এমনও হয় যে, একটা পর্যায়ে গিয়ে এই স্টাইলিশ দাড়িটুকুও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানে তো শুধু উদাহরণস্বরূপ মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা একজন ব্যক্তির পরিবর্তনের দৃশ্য উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়াও ভার্সিটির পরিবেশে গিয়ে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিত্র অনেক। অনেকে এস.এস.সির পর তাবলিগে সময় দিয়ে দ্বীন পালন করতে শুরু করে। হয়তো কলেজের সময়টাতেও সে প্র্যাকটিসিং থাকে। কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা কলেজে থাকতে ধর্মকর্মের কিছু তোয়াক্কা করলেও ভার্সিটিতে প্রবেশ করে দ্বীন-ধর্মের আর কোনো তোয়াক্কাই করে না। এমন দৃষ্টান্ত তো ভুঁড়ি ভুঁড়ি যে, স্কুল লাইফে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করত, কিন্তু ভার্সিটিতে এসে আর নামাজই পড়ে না। স্কুল-কলেজে মেয়ে বন্ধু থেকে দূরে থাকা হাজারো ছেলে ভার্সিটিতে এসে হারাম রিলেশনে জড়িয়ে যাচ্ছে। আসলে ভার্সিটি জীবনের রঙিন পরিবেশে এসে অনেকেই এমন উন্মাদনায় হারিয়ে যায়, যে উন্মাদনার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ এতদিন পর্যন্ত সে পায়নি। যার ফলে খুব দ্রুত তার মাঝে অনেক বড় ধরনের পরিবর্তন চলে আসে।

আমরা যখন বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছি তখন সন্ধ্যা হতে হতেই খেলাধুলা সব শেষ করে মাগরিবের আজানের আগে আমাদের ঘরে ঢুকতে হয়েছে। তখন আমরা একটা নিয়ম ও জবাবদিহির মাঝে ছিলাম। এরপর ভার্সিটির স্বাধীন পরিবেশে একটা ছেলে খাহেশাতের নানা ধূম্রজালে হারিয়ে যাওয়া তো খুবই সহজ। যে মেয়েটা জীবনে কখনো মাগরিবের পরে বাসার বাইরে থাকেনি, সে মেয়েটা যখন ভার্সিটিতে এলো, তখন সে অনেক রাত পর্যন্ত বয়ফ্রেন্ডের সাথে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অবাধ সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। মূলত এসব কারণেই ভার্সিটিতে আসার পর দ্বীনের ওপর থাকা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

এখন দেখা যাচ্ছে, এই মেয়েটা আস্তে আস্তে তার জীবনধারাই পরিবর্তন করে ফেলেছে। পূর্বে সে বোরকা-নিকাব পরত, ধীরে ধীরে সে তা থেকে বের হয়ে

যাবে। বোরকা পরিহার করে শুধু মাথাটুকু ঢাকা যায় এমন হিজাব ব্যবহার শুরু করবে। একসময় সেটাও থাকবে কোনো রকম গলায় একটা ওড়না ফেলে রাখবে। দেখা যায়, ধীরে ধীরে সে হেদায়াত থেকে এতটাই দূরে সরে যায় যে, এখন আর সে এসব ওড়নার তোয়াক্কা করে না। ছেলেদের সাথে সমানতালে শার্ট-প্যান্ট পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মূলত এটা একটা বড় সমস্যা। ভার্সিটির যে বদদ্বীনি পরিবেশ, তা আমাদের হেদায়াতকে কেড়ে নেয়, আমাদের মনে নানা রকম ওয়াসওয়াসা তৈরি করে, আমাদের কু-প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করে তোলে, মনের মাঝে হাজারো খাহেশাতের জন্ম দেয়। যেই রঙিন স্বাদের চিন্তাও কখনো মাথায় আসেনি সেই স্বাদকেই ভার্সিটি আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়। এটা একটা ভয়াবহ সমস্যা। এই সমস্যার কারণে বহু ছেলে-মেয়ে, মাদরাসায় পড়া সম্পন্ন করা অনেক তলাবা-উলামা, দ্বীনি সংস্কৃতিতে বড় হওয়া বহু দ্বীনি পরিবারের সন্তান হেদায়াত থেকে ছিটকে পড়ছে।

আর এর মূল কারণ হচ্ছে নিজের খাহেশাত ও অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিকে দ্বীন ও শরিয়তের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। জেনেবুঝে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া। যার ফলে আল্লাহ তাআলাও বান্দা থেকে স্বীয় হেদায়াত উঠিয়ে নেন। তাই একটা জিনিস সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, ভার্সিটির এই সেক্যুলার পরিবেশে কখনোই যেন আমরা নিজেদেরকে ভাসিয়ে না দিই। নিজেদের ঈমান-আমলকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমরা দ্বীনি কমিউনিটির প্রত্যেকেই যেন পরস্পরকে সহযোগিতা করি। শুধুমাত্র পড়াশোনাটুকু ছাড়া ক্যাম্পাসে আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই। পড়াশোনা ছাড়া এখানে অন্য আরও যত একটিভিটিজ আছে, সেগুলো আমাদের জন্য জরুরি না। আমাদের জন্য জরুরি হচ্ছে নিজেদের ঈমান-আমলের হেফাজত করা।

আমি যখন দ্বীন পালন করতে আগ্রহী তখন বান্ধবী বা সহপাঠী নামের এই গায়রে মাহরাম মেয়েদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘ আড্ডা দেওয়া আমাদের কাজ হতে পারে না। আমরা এখানে পড়াশোনা করব, ক্লাস করব, লাইব্রেরিতে যাব, এরপরে আমাদের নিজ নিজ থাকার জায়গায় চলে যাব। ভার্সিটি লাইফ উপভোগ করো, এনজয় করো, মাস্তি করো, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে থাকো—এগুলো কোনো দ্বীন পালনকারী ব্যক্তির স্লোগান হতে পারে না। এগুলো সব অনর্থক কথাবার্তা। এনজয় আবার কী জিনিস? উপভোগ করতে

চাইলে প্রতিকূল পরিবেশে দ্বীন পালনের স্বাদ উপভোগ করো। ফেতনার বেষ্টনীতে থেকে ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার চ্যালেঞ্জকে উপভোগ করো। মনের খাহেশাতকে চরিতার্থ করার উপভোগের চক্করে পরকালকে বরবাদ করার দরকার নেই।

মেয়ে সহপাঠীদের থেকে দূরে থাকা

ভার্সিটির উন্মুক্ত পরিবেশে সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে নারী। তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আল্লাহর জন্য এটা আমাদের করতেই হবে। নারীকে বলা হয়েছে শয়তানের তির। এই তিরের সামান্য আঁচড়ও যেন আমার ঈমানের ওপর লাগতে না পারে। কারও যদি বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে ফ্রি-মিক্সিং সার্কেল থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য আজকে থেকে তা ছেড়ে দিন। এর চেয়ে উত্তম অনেক দ্বীনদার, মুত্তাকি, পরহেজগার মানুষজনদের দ্বারা আল্লাহ আপনার জীবনকে সাজিয়ে দেবেন, ইনশাআল্লাহ। এই ফ্রি-মিক্সিং সার্কেলের সমস্যা থেকে বড় সমস্যা আর হয় না। অনেক বড় বড় দ্বীনদার এখানে এসে আটকে যায়। তাই দ্বীনের পথে অবিচল থাকার জন্য এই কুরবানিটুকু করতেই হবে। আল্লাহর জন্য প্রিয় বস্তু কুরবানি অনেকেই করছে, আমরা কি এই সামান্য কুরবানি করতে পারব না? কত মানুষ এই দ্বীনের জন্যে শহিদ পর্যন্ত হয়েছেন, জীবনের মায়া ত্যাগ করেছেন, নিজের জীবনকে দ্বীনের চেয়ে বড় মনে করেননি। সেখানে আমি একটা ফ্রেন্ড সার্কেল পরিবর্তন করতে পারব না? কিছু মানুষের সঙ্গত্যাগ করতে পারব না? এটা কী করে হতে পারে? এটা বড়ই দুঃখজনক যে, প্র্যাকটিসিং ভাইয়েরাও মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না। মনে রাখবেন, হেদায়াতের ওপর থাকতে চাইলে এই নারীসঙ্গ ছাড়তেই হবে। কেননা এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের সতর্ক করেছেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء.

‘আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক অন্য কোনো ফেতনা রেখে যাইনি।’[১৯]

---

[১৯] সহিহ বুখারি : ৫০৯৬; সহিহ মুসলিম : ২৭৪০।

বুঝতেই পারছেন দ্বীনের ওপর টিকে থাকতে হলে ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতেই হবে।

ভার্সিটির হলে থাকার ক্ষেত্রে করণীয়

আসলে কোনো যুগেই মানুষ ফেতনা থেকে মুক্ত ছিল না। এখনো নেই, আর কখনো থাকবেও না। এখন যেহেতু ভয়াবহ ফেতনার যুগ চলছে, তাই আমাদের উচিত সহশিক্ষা ত্যাগ করে ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাদের পারিবারিক সাপোর্ট আছে, তারা সহশিক্ষা ত্যাগ করে ফেলুন।

আর যারা পারছেন না তারা আলেমদের পরামর্শ নিয়ে চলুন। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য যে, আমরা পরামর্শ করা ছাড়া বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। অথচ আল্লাহ তাআলা পরামর্শ করে কাজ করতে বলেছেন। অবশ্যই আমাদের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রবীণ আলেমের পরামর্শ নিয়ে চলা উচিত। আপনি পড়াশোনা করছেন? কী সাবজেক্ট নেবেন, আলেমের সাথে পরামর্শ করুন। বিয়ে করবেন, আলেমের সাথে পরামর্শ করুন। চাকুরিতে ঢুকবেন, আলেমের শরণাপন্ন হোন। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রবীণ আলেমের সাথে পরামর্শ করার অভ্যাস গড়ুন। তাহলে দেখবেন আপনি যেটাই করছেন না কেন, তা দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। তখন তাতে বরকত হবে। আল্লাহ আপনার নেক ইচ্ছাকে কবুল করে নেবেন।

আপনারা যারা বাধ্য হয়ে হলে থেকে পড়াশুনা করছেন। বলছিলাম, ভার্সিটির হলে থাকা বিষয়ে। প্রথমত চেষ্টা করবেন হলের বাইরে থাকতে পারেন কি-না। কয়েকজন দ্বীনদার বন্ধু মিলে, বা সে রকম দ্বীনদার না হলেও মোটামোটি দ্বীনের প্রতি আগ্রহ আছে এমন সহপাঠীরা মিলে একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে পারলে ভালো। যদি তা সম্ভব না হয় এবং একান্তই হলে থাকতে বাধ্য হন, সে ক্ষেত্রে তো আপনি অপারগ। এমতাবস্থায় অপারগ হয়ে আপনি সেখানে থাকবেন এবং সব সময়ই বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ সন্ধান করবেন। আর থাকতেই যখন হচ্ছে, তখন তাওবা-ইস্তেগফারের সাথে থাকুন। নিজেকে যাবতীয় অনৈতিক কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। দীনী কমিউনিটি, যেমন তাবলীগের সাথে সাথে থাকুন। বদদ্বীনি থেকে দূরে থাকুন। সম্ভব হলে রাতে তাহাজ্জুদের অভ্যাস করুন। শেষরাতে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে নিজের সার্বিক অবস্থার জন্যে রোনাজারি করুন। আল্লাহর কাছে দ্বীনের ওপর অবিচল

থাকার তাওফিক প্রার্থনা করুন। আল্লাহ একটা না একটা উপায় অবশ্যই বের করে দেবেন। আল্লাহ যেহেতু আমাদের বিচারক, সেহেতু বিচারককে রাজি-খুশি রাখতে হবে, তাঁর কাছে নিজের অবস্থা বারংবার বলতে হবে। তিনি যেহেতু রহমান (অতি দয়াশীল) অবশ্যই তিনি আপনার প্রতি রহম করবেন। আপনাকে দ্বীনের জন্য অনুকূল পরিবেশে থাকার বন্দোবস্ত করে দেবেন।

স্বীয় খাহেশাতের পক্ষে দলিল খোঁজা

যখন আমরা ইসলামের সামনে আত্মসমর্পণ না করে বরং ইসলামকেই আমাদের মর্জিমতো বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব, তখন আমাদের হেদায়াত হারিয়ে যাবে। যেমন, কেউ কেউ গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের পক্ষে দলিল খোঁজে বেড়ায়। কোনো কোনো বোন চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলিল তালাশ করে। পূর্বে সে পর্দা রক্ষা করে চলত, হিজাব ও নিকাবকে ভালোবাসত। কিন্তু এখন সে নিকাব ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে কী কী দলিল আছে, সেগুলোর সন্ধান করছে। অনুরূপভাবে কোনো ভাই আগে পাঞ্জাবি-টুপি পরাকে ভালোবাসত। দাড়ি রাখা পছন্দ করত। দাড়িকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত জানত এবং দ্বীনের অংশ মনে করত। কিন্তু এখন সে এগুলো বর্জন করার জন্য সুযোগ খোঁজছে। কে কে দাড়ি না রাখার পক্ষে বলেছে, তাদের বক্তব্যগুলো একত্রিত করছে।

দেখুন, চৌদ্দশ বছর ধরে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নানা জন নানা রকম বক্তব্য দিয়েছেন। বিশেষ করে ইজতেহাদি বিষয়গুলোতে ইমামগণ নিজ নিজ ইজতেহাদ-গবেষণা অনুপাতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বোঝার বিষয় হচ্ছে সকল ইমামের সব মতই কি অনুসরণীয়? এখানে একজন ইমামেরই অনেক 'শায' বা বিচ্ছিন্ন মত থাকে। থাকে অনেকের বিচ্ছিন্ন ও একক গবেষণা। অনেকে অনেক কথা বলে গেছেন, কিন্তু পরবর্তী গবেষকগণ সেগুলোর ওপর আরও বিস্তর গবেষণা করেছেন। কোন মতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে আর কোন মতের ওপর আমল বর্জন করা হবে—সুনির্দিষ্ট উসুলের আলোকে তারা সেটা নির্ধারণ করেছেন। কোন মত 'রাজেহ' (আমলযোগ্য) আর কোন মত 'মারজুহ' (আমলযোগ্য নয়)—এগুলো তো শাস্ত্রীয় বিষয়। কাগজের পাতায় কোনো ইমামের নামে কিছু লেখা পেলেই তা পালনীয় হয়ে যায় না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন স্বীয় খাহেশাতের পক্ষে দলিল খুঁজে বেড়ায়,

তখন সে খুঁটে খুঁটে এসব 'শুযুয' (বিচ্ছিন্ন) ও 'মারজুহ' (আমলযোগ্য নয়) বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে। সে বোঝাতে চায় সে যা করছে সালাফদের থেকে তার পক্ষে দলিল আছে। কিন্তু সেই দলিল যে দলিলই হওয়ার যোগ্য না, তা তাকে কে বোঝাবে। নফসের গোলামি করা নিজেই একটা ভ্রষ্টতা, আর সেই গোলামিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা মহা ভ্রষ্টতা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত ছাড়া কেবল নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।'[২০]

মোটকথা, কেউ যদি নিজের খাহেশাতের পক্ষে দলিল খুঁজতে যায়, তার পক্ষে কোনো না কোনো শায ও মারজুহ মত পেয়ে যাবে। যেমন, অনেক ভাই গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে জায়েজ প্রমাণ করার জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যাচ্ছে। কোথাও ভুল দলিল উপস্থাপন করছে, আবার কখনো দলিলের মাঝে কারচুপি করে নিজের মতকে সাব্যস্ত দেখাচ্ছে। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে যে, এগুলো হেদায়াতের পথ নয়। এগুলো হচ্ছে স্বীয় নফস ও খাহেশাতের গোলামি।

মনে রাখতে হবে, ইসলামকে নিজের মর্জিমাফিক বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। বরং আমাকেই ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এ জন্য নিজের খাহেশাতের বৈধতার জন্য কোনো মনীষীর বিচ্ছিন্ন বক্তব্য ও পদস্খলিত আমলের পেছনে পড়া যাবে না। ইবলিসকে আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আ.-কে সেজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত আদম আ.-এর সামনে ইবলিস শয়তান সেজদা করেনি। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কেন সেজদা করলে না? একজন প্রকৃত আল্লাহর গোলাম ও আল্লাহপ্রেমীর করণীয় হচ্ছে, কখনো ভুল হয়ে গেলে সেই ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিন্তু সেটা করেনি। বরং সে নিজের ভুল ও খাহেশাতের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল। নিজের অহংকারকেই সঠিক ও ন্যায্য সাব্যস্ত করতে চেয়েছিল। ইবলিস উত্তর দিলো,

---

২০] সুরা কাসাস : ৫০।

﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾

'আমি তার চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা।'[২১]

আল্লাহর আদেশের বিপরীতে ইবলিস নিজের খাহেশাত ও অহংকারের পক্ষে যুক্তি দিলো। কিন্তু ভুলের পক্ষে তার এই দলিল আল্লাহ তাআলার নিকট গৃহীত হয়নি। সে অভিশপ্ত শয়তান হিসেবে চিহ্নিত হলো। চিরদিনের জন্য আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হলো। পক্ষান্তরে হজরত আদম আ.-কে যখন জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো, তখন তিনি নিজের ভুলের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখাননি। বরং তিনি সরাসরি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন,

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সত্তার ওপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[২২]

এখান থেকে শিক্ষণীয় হচ্ছে, আমাদের দ্বারা ভুল হয়ে যেতে পারে, গুনাহ হয়ে যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে, আমরা কোনো গুনাহকে সহজে ছাড়তে পারছি না। এমনও হতে পারে, গান শোনার একটা অভ্যাস আমাদের কারও মাঝে ছিল এবং এটাকে আমরা এক নিমিষেই ছেড়ে দিতে পারছি না। বারবার চেষ্টা করছি আর ব্যর্থ হচ্ছি। কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত রাখলে হয়তো একসময় আমাদের সেই গুনাহ বর্জন করার তাওফিক হবে এবং মন থেকে তাওবা-ইস্তেগফার করার দ্বারা আল্লাহ আমাদের মাফও করে দেবেন। কিন্তু আমি ছাড়তে পারছি না বলে যদি সেই গুনাহের বৈধতা খুঁজতে শুরু করে দিই, ভুলের পক্ষে নানা যুক্তি-দলিল দেখাতে থাকি, তাহলে সেটা হবে মারাত্মক গোমরাহি ও আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন। ভুলের পক্ষে আমার এই দলিল আল্লাহর নিকট গৃহীত তো হবেই না, বরং আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। মাআযাল্লাহ।

---

[২১] সুরা আরাফ : ১২।
[২২] সুরা আরাফ : ২৩।

বেশি বেশি দাওয়াত দেওয়া

দ্বীনে ফেরার পর দ্বীনের ওপর অবিচলতার জন্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকা জরুরি। কেননা আমরা যদি সত্যের দাওয়াত না দিই, ইসলামের সঠিক দাওয়াতের প্রচার না করি, তাহলে বাতিলের দাওয়াত আমাদের সামনে চলে আসবে। তখন বাতিল আমাদের গোমরাহির পথে ডাকতে থাকবে। এই যে আমরা যারা কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ছি বা আমাদেরকে সহশিক্ষার পরিবেশে থাকতে হচ্ছে, **এই পরিবেশে আমরা যদি আমাদের আশপাশের মানুষগুলোকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত না দিই, তাহলে তারাই উলটো আমাদেরকে দ্বীন ছাড়ার দিকে আহ্বান জানাবে।** শয়তান তাদের ওপর সওয়ার হয়ে আমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দেবে।

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, কোনো প্র্যাকটিসিং ভাই চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে। এ সময় মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। এখন আজান শোনার পর সে যদি তার বন্ধুদের বলে যে, তোরা থাক আমি নামাজ পড়ে আসি। তাহলে কী হবে? 'আমি নামাজ পড়ে আসি' এটা বললে তার বন্ধুরা তাকে বলবে, আরে আরেকটু বস। মাত্রই তো আজান হলো। একটু পরে যাস বা পরে পড়ে নিস। এভাবে তার জামাত ছুটে যাবে। দেখা যাবে কোনো সময় বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে তার দুয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজাও হয়ে যেতে পারে। কারণ, সে তাদের দাওয়াত দেয়নি। ফলে তারাই তাকে গোমরাহির দিকে ডাকার সাহস পেয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে আজান শোনার পর সে যদি তার বন্ধুদেরকেও নামাজের দিকে ডাকত এবং এভাবে বলত যে, চল আমরা সবাই নামাজ পড়ে আসি। চল সবাই যাই। তাহলে দেখা যেত তারা নামাজে না গেলেও তাকে বাধা দিত না। তারা বলত, যা তুই পড়ে আয়, আমরা এখানে আছি। হয়তো-বা এক-দুজন তার সাথে মসজিদে যেতেও রাজি হয়ে যেত। বা একান্তই কেউ যদি না-ও যায়, কিন্তু তাকে কেউ বাধা দেবে না। এভাবে সে দাওয়াতকে অব্যাহত রাখলে একটা সময় গিয়ে দেখা যাবে তার সাথের বন্ধুরাও নামাজি হয়ে গেছে।

মোটকথা প্রতিকূল পরিবেশে আমাদেরকে দাওয়াতের মেজাজে থাকতে হবে। দাওয়াতি মনোভাবের ওপর পরিপূর্ণ ইস্তেকামাত (দৃঢ়তা) আনতে হবে। সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। যে নামাজ পড়ে না তাকে নামাজের দাওয়াত দেবো। যে একটু সেক্যুলার মাইন্ডের, তাকে ইসলামের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্বের দাওয়াত দেবো। এভাবে দাওয়াত দিতে থাকলে আমাদের দাওয়াতে

তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে কি-না জানি না, তবে আমাদের নিজেদের দ্বীন পালনের পরিবেশ তৈরি হবে। নিজেরা দ্বীনের ওপর থাকা সহজ হবে। এ জন্য দ্বীনে ফেরার পর নিজের ঈমান-আমলকে মজবুত করার পাশাপাশি চারপাশের মানুষগুলোকেও আমরা দ্বীনের দিকে ডাকতে থাকব। তবে মনে রাখতে হবে যে, নিজের দাওয়াত ও আমলের মাঝে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। নইলে নিজেরই বিপদ।

নিজের দ্বীনদারিতে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া

মনে রাখতে হবে, দ্বীনে এসে দ্বীন পালন করতে শুরু দেওয়াটাই শেষ নয়। বরং এখান থেকে এই যাত্রার সূচনা মাত্র। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দ্বীনের ওপর আমাকে অটল-অবিচল থাকতে হবে। মৃত্যুটা ঈমানের সাথে না হলে সারা জীবনের এসব আমল কোনো কাজেই আসবে না। মুমিনের জন্য তার ঈমান-আমল মহা মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদকে সংরক্ষণের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নিজের দ্বীনকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

আমরা অনেকেই এমন আছি, যারা টুকটাক দ্বীনের ওপর চলার চেষ্টা তো করি, কিন্তু ভাবসাবে মনে হয় নিজের দ্বীন নিয়ে আমরা ততটা সিরিয়াস না, যতটা হওয়ার দরকার ছিল। যেমন-তেমন ভাবে পার করে দিচ্ছি আরকি। যেন একরকম চলে গেলেই তো হলো। নামাজ তো পড়ছি, জায়েজের ওপরই তো আছি। এটা তো সাধারণ মাকরুহ, হারাম তো আর না। এভাবে নিজের মনকে বুঝিয়ে নিয়ে কোনো রকম চালিয়ে দিচ্ছি। এটা ঠিক না। দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে শতভাগ সচেতন হতে হবে। প্রতিনিয়ত নিজের দ্বীনি ইমপ্রুভমেন্টের ফিকির করতে হবে। আপনি যখন সামনে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবেন, তখন সামনে আগাতে না পারলেও অন্তত পেছনে সরে যাবেন না। পক্ষান্তরে যদি বর্তমান অবস্থানেই সন্তুষ্ট থাকেন, উন্নতির ফিকির না করেন, তাহলে এই অবস্থান ধরে রাখাই কষ্টকর হয়ে যাবে।

ইসলামি বিধানসমূহের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। মুবাহ-জায়েজ, মুস্তাহাব, সুন্নত, ওয়াজিব, ফরজ। রয়েছে তাকওয়া ও পরহেজগারির স্তর। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের ওপর ফরজ। ফরজগুলো ছাড়াও প্রতি ওয়াক্তেই কিছু কিছু সুন্নত ও নফল রয়েছে। অনেকে শুধু ফরজটুকুই আদায় করে, অলসতা করে ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে সুন্নত-নফলের প্রতি গুরুত্ব দেয় না। অথচ সুন্নতগুলোও

জরুরি। নিয়মিতভাবে সুন্নত তরক করাও তো গুনাহ। হাদিস শরিফে এসেছে নফল দ্বারা বান্দার ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এদিক থেকে নফলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। **ফরজ তো আবশ্যিক পালনীয় বিধান, যা লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই। আর নফলগুলো হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।** তাই ফরজের পর অধিক পরিমাণ নফল আদায়ের দ্বারা বান্দা স্বীয় রবের নিকটবর্তী হতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন ধরুন, তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ বা ওয়াজিব না। অর্থাৎ না পড়লে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তারপরেও আমাদের তাহাজ্জুদ পড়তে হবে। কেননা এর দ্বারা আমি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হতে পারব এবং আমার দ্বীনের উন্নতি ও দ্বীনের পথে ওপরের দিকে অগ্রসর হতে পারব। দ্বীনের ব্যাপারে সর্বদা উন্নতির দিকে থাকতে হবে। কখনো নিচের দিকে নামা যাবে না।

অনুরূপভাবে গুনাহের মধ্যেও নাজায়েজ, মাকরুহ, হারাম—বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আমরা অনেকেই হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরি মনে করলেও মাকরুহ বা নাজায়েজ থেকে বিরত থাকাকে জরুরি মনে করি না। মাকরুহ মানে কী? অপছন্দনীয়। তার মানে হতে পারে এর গুনাহটা হারামের তুলনায় কম, কিন্তু কাজটা তো আল্লাহ অপছন্দ করেছেন। শরিয়ত একে নিন্দনীয় আখ্যায়িত করেছে। তাহলে আমার দ্বীনের দাবি তো হচ্ছে আমি গুনাহের দিকে তাকানো ছাড়াই এই কাজ থেকে বিরত থাকব। মূলত ইসলামের প্রতিটা বিধান—হোক সেটা মুস্তাহাব বা মাকরুহ—তার মাঝে বহু হেকমত ও কল্যাণ নিহিত থাকে।

ইসলামের বাহ্যিক বেশভূষার মাঝেও রয়েছে দ্বীন রক্ষার প্রটেকশন। যেমন ধরুন, একটা শার্ট-প্যান্ট পরা ছেলে যদি রাস্তায় স্মোক করে, তাহলে মানুষ এটাকে খুব একটা গুরুত্বের চোখে দেখবে না। কিন্তু যদি পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা একটা দাড়িওয়ালা ছেলে প্রকাশ্যে স্মোক করে, তাহলে এটাকে মানুষ অনেক বেশি খারাপভাবে দেখে। এর একটা প্রভাব কিন্তু ব্যক্তির ওপরও পড়ে। যার ফলে দেখা যায়, ইসলামি বেশভূষায় থাকাকালীন অনেক মন্দ কাজের দিকে এমনিতেই মন যায় না। মূলত গেট-আপের একটা ব্যাপার আছে। আপনি যখন দ্বীনি গেট-আপে থাকবেন তখন মন চাইলেও অনেক মন্দ কাজের দিকেই আপনি অগ্রসর হতে পারবেন না। এটা একধরনের প্রটেকশন। যখন কোনো ভাই দাড়ি মুখে, টুপি-পাগড়ি পড়ে ভার্সিটিতে যাবে, স্বাভাবিকভাবেই কোনো মডার্ন মেয়ে এসে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেবে না। কোনো বোন যখন পরিপূর্ণভাবে নিকাব করে ভার্সিটিতে যাবে, (যেহেতু তাকে বাধ্য হয়েই ভার্সিটিতে যেতে হচ্ছে এবং সে চাইলেই ভার্সিটি ছেড়ে দিতে পারছে না।) তখন

হুট করেই কোনো ছেলে এসে তাকে উত্ত্যক্ত করতে পারবে না, বা প্রেমের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে না। এসব ফেতনা থেকে সে হেফাজতে থাকবে। দাড়িওয়ালা ছেলেকে তো সেক্যুলার মাইন্ডেড মেয়েরা এমনিতেই পছন্দ করে না। সুতরাং এ ধরনের অনেক প্রব্লেম থেকে সে এমনিতেই বেঁচে যাবে। অনেক নামধারী দ্বীনি মেয়েরা তাকে পছন্দ করলেও করতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিবাহবহির্ভূত যেকোনো এপ্রোচ খাস পর্দাকারী নারী থেকে আসলেও তা হারাম। বুঝে নিতে হবে যে, দ্বীন এই নারীর লেবাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; এখনো তা অন্তরে প্রবেশ করেনি। তাই এমন নারীদের থেকেও নিজেকে হেফাজত করতে হবে এবং এদের ব্যাপারে বেশি সচেতন থাকতে হবে। তাই নিজের দ্বীন রক্ষার্থে দ্বীনি ভাইদের উচিত যথাসম্ভব দ্বীনি লেবাসে থাকা। একদিন টুপি, পাঞ্জাবি, পায়জামা পরে রাস্তায় বের হয়ে দেখবেন, আর প্যান্ট-শার্ট পরে বের হয়ে দেখবেন; নিজেই এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারবেন। একটা পাঞ্জাবি, টুপি পরা ছেলে চাইলেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকাতে পারে না। সে রাত-বিরাতে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের খেলা নিয়ে শোরগোল করে এলাকা মাতাতে পারে না। ইচ্ছে হলেই সে কোনো মেয়ের দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকতে পারে না। যে মেয়েটা বোরকায় আবৃত হয়ে পর্দার মাঝে বাইরে বের হচ্ছে আর যে খোলামেলা পোশাকে বাইরে যাচ্ছে, দুজনের প্রটেকশন কখনো সমান হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

‘হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’[২৩]

কারও কারও এমন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যে, সে শুধু হারাম থেকে বাঁচবে আর জরুরি ফরজগুলো পালন করবে। কিন্তু এটা ভুল অবস্থান। **একটা সহজ জিনিস বোঝার চেষ্টা করুন, যখন আমরা জিরোতে থাকব, তখন তো আমাদেরকে মাইনাসে নিয়ে যাওয়া সহজ। কিন্তু আমরা যদি সব সময় ওপরের দিকে থাকি, তাহলে নিচের দিকে টানলেও খুব বেশি নিচে নামানো যাবে না, বা তা মাইনাস পর্যন্ত**

---

[২৩] সুরা আহজাব : ৫৯।

গিয়ে পৌঁছবে না। এটাই হচ্ছে মুস্তাহাব-নফলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ও মাকরুহ-নাজায়েজ থেকে বেঁচে থাকার মাহাত্ম্য। আমরা যখন পজিটিভের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে থাকব, তখন কিছু মাইনাস হয়ে গেলেও আমরা পজিটিভের স্তরেই থাকব। নেগেটিভে নেমে যেতে হবে না। আর যদি অবস্থান হয় শূন্যতে, তাহলে তো সামান্য ধাক্কাতেই তা মাইনাসের ঘরে চলে যাবে। আর একবার নিচে নেমে গেলে তা রিকভারি করে ওপরে ওঠে আসা খুব একটা সহজ কাজ নয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের কিছু ভাইদের মানসিকতা হচ্ছে তারা শুধু ইসলামের ততটুকুই মানবে, যতটুকু না করলেই না, এর বেশি তারা মানতে নারাজ। অথচ হুকুমের দিক থেকে সাধারণ হলেও কিছু বিষয় হচ্ছে ব্যক্তির দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য PPE (Personal Protective Equipment)-এর মতো।

আমরা দেখে থাকব যে, ডাক্তাররা ডিউটিতে থাকাকালীন PPE পরিধান করে। যাতে করে রোগীর দেহ থেকে কোনো রোগ-জীবাণু তার শরীরে সংক্রমিত হতে না পারে। ডাক্তারি বিদ্যার সাথে এই PPE-এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা ছাড়াও ডাক্তারি করা যাবে। কিন্তু তারপরও ডাক্তাররা PPE ব্যবহারের প্রতি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? কারণ, এটা তার প্রটেকশন। ইসলামের বাহ্যিক বেশভূষা ও ছোট ছোট বিষয়গুলো এ রকমই। সেগুলো পালন না করেও মুসলিম থাকা যাবে, কিন্তু সেগুলো ছাড়া নিজের দ্বীনকে রক্ষা করা মুশকিল হয়ে যাবে। নারীদের জন্য নেকাব ব্যবহার করা ফরজ কি-না সেই মতপার্থক্যের সমাধান তো আলেমরাই দেবেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে নেকাব নারীর দ্বীন রক্ষার প্রটেকশন। নিজের সম্মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষা। একটা কথা আমি সব সময় বলি যে, চানাচুরের প্যাকেট ঠিক থাকলে ভেতরের চানাচুরও মচমচে থাকবে। আর প্যাকেট যদি ফুটা থাকে, তাহলে চানাচুরটাও নষ্ট হয়ে যাবে। তদ্রূপ ঈমানের বিষয়টাও এমনই। বাহ্যিক দ্বীনদারি ঠিক থাকলে ভেতরের ঈমানও সুরক্ষিত থাকবে। আর বাহ্যিক প্রটেকশনে ঘাটতি থাকলে ঈমানও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।

মোটকথা নিজের দ্বীন রক্ষার ফিকির থাকতে হবে। দ্বীনি কার্যক্রমের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখতে হবে। এতে নিজের দ্বীনকে হেফাজত করা সহজ হবে আল্লাহ আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন। আমিন।

দ্বীনকে কঠিন মনে করা

দ্বীন পালনের তাওফিককে আল্লাহ তাআলার অশেষ নেয়ামত মনে করা চাই। প্রতিনিয়ত দ্বীনের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেন বৃদ্ধি পায়। এমন যেন না হয় যে, কোনো এক হুজুগে পড়ে দ্বীন মানতে শুরু করার পর, এখন তা বোঝা মনে হচ্ছে। কেননা কোনো জিনিসের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই তাতে স্থায়িত্ব আসে। আর বোঝা মনে করলে তা বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। **মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা ভালোবেসে ও নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দ্বীনের পথে নিয়ে এসেছেন এবং হেদায়াতের আলো দ্বারা আমাদের আলোকিত করেছেন। আমাদের কোনো যোগ্যতা ছিল না যে, আমরা দ্বীনের পথে আসতে পারব।** ধন-সম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, বংশমর্যাদা ও শরীর-স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী বহু মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে আছে। যদি নিজস্ব যোগ্যতায় দ্বীন মানা যেত, তাহলে তারা আমাদের চেয়ে বড় দ্বীনদার হতো। কিন্তু এটা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে চান কেবল তাকেই দান করেন। বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা আমাকে মনোনীত করেছেন বলেই আমি দ্বীনের পথে চলতে পারছি। রব্বে কারিমের এই সীমাহীন ভালোবাসার নিদর্শন—হেদায়াতকে আমরা যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে না করি, এই নেয়ামতের জন্য রবের দরবারে যদি শুকরিয়া আদায় না করি, বরং দ্বীনের বিধি-নিষেধকে বোঝা মনে করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই মূল্যবান হেদায়াতকে আমাদের থেকে উঠিয়ে নিতেও দেরি করবেন না। মাআযাল্লাহ।

তাহলে আমাদের করণীয় কী? করণীয় হচ্ছে, এই হেদায়াতকে নেয়ামত মনে করতে হবে। দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা বাড়াতে হবে। দ্বীন পালনে একনিষ্ঠ হতে হবে। দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ হচ্ছে উত্তরোত্তর দ্বীনের পথে আমাদের যেন তরক্কি হয়। আমরা যেন দ্বীন পালনে আরও বেশি উদ্যমী হই। **দ্বীন ইসলামের বিপরীতে গোটা দুনিয়া যেন আমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়।** আমরা যেন আল্লাহর দিকে আরও বেশি অগ্রসর হই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসরণের ব্যাপারে আরও বেশি সচেতন হই। এগুলো হচ্ছে দ্বীনকে ভালোবাসার নিদর্শন। দ্বীনের বড়দের প্রতি, দ্বীনের আলেমদের প্রতি আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা যেন বৃদ্ধি পায়। নিজেকে কখনো তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীন ইসলাম দিয়েছেন। অতঃপর দ্বীনের নবী প্রেরণ করেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দ্বীনের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করে

আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসুল নতুন দ্বীন নিয়ে এই ধরাতে আগমন করবেন না। নতুন করে আর কোনো ওহি আসবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

> 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।'[২৪]

তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কিতাব তথা কুরআন মাজিদ এবং তাঁর সুন্নাহকে আমাদের মাঝে রেখে গেছেন। সেইসাথে কুরআন-সুন্নাহর সহিহ বুঝ ও সঠিক মর্মকে বক্ষে ধারণকারী আলেমদেরকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে উম্মতের দিক-নির্দেশনার জন্য রেখে গেছেন। যুগে যুগে কুরআন-সুন্নাহর সহিহ ইলমকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং দ্বীনকে সঞ্জীবিত করার জন্য এই দ্বীনের মাঝে আলেম তৈরি হতে থাকবে। এ জন্য উম্মতের সাধারণ সদস্যরা কখনোই আলেমদের থেকে বিমুখ হওয়ার সুযোগ নেই।

পারিবারিক চাপ

আমাদের অনেকের পরিবারেই এমন অবস্থা যে, আমাদের বাবা-মায়েরা দ্বীনদার না। কারও বাবা-মা নামাজ-রোজা করলেও সেভাবে দ্বীনের প্রতি ডেডিকেটেড না। আবার অনেকের বাবা-মা সেক্যুলার জীবনযাপন করছেন। অবশ্য এর পেছনেও কারণ আছে। কেননা তারা যখন আমাদের মতো বয়সে ছিলেন, তখন মজলুমের অধিকার আদায় বা বিপ্লবী চিন্তাধারা বলতে সে সময় তারা কমিউনিজমকেই বুঝতেন। যার কারণে তাদের মধ্যে সেক্যুলারিজম বা এ ধরনের বিষয়গুলো কিছুটা রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার নামাজ-রোজা করেছেন ঠিকই, কিন্তু ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বোঝার মতো পরিবেশে তখন তারা ছিলেন না। কিংবা সে সময় তারা এই সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে দূরে ছিলেন।

---

[২৪] সুরা মায়েদা : ৩।

কিন্তু আল্লাহর তাআলার অশেষ মেহেরবানি যে, বর্তমান সময়ে আমাদের জেনারেশনের অনেকেই ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের যে সংঘাত, সেটাকে তারা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারছে। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ বিশ্ববিধান, এই বিষয়গুলোর ওপর আমাদের সামনে এখন পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্ভার রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়গুলো এখন আমাদের কাছে মোটামুটি ভালোই পরিষ্কার। এদিক থেকে দেখা যায় যে, দ্বীন পালন করতে গিয়ে পরিবারের সাথে আমাদের কিছু বিষয়ে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দেয়। কোনো কোনো পরিবারে আবার নামাজ-রোজা পালনের ক্ষেত্রেও বাধা আসতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে আমাদের অধিকাংশের অবস্থাই হচ্ছে দ্বীন মানতে গিয়ে আমরা কোনো না কোনোভাবে পারিবারিক চাপের শিকার হই। এই পারিবারিক চাপের কারণে আমাদের অনেক ভাই-বোন অনেক সময় দ্বীন পালন ছেড়ে দেয়। বিষয়টা খুবই দুঃখের ও কষ্টের। পরিবারেই যদি দ্বীন পালনের জন্য ভালো একটা পরিবেশ না পাওয়া যায়, তাহলে তো দ্বীনে থাকাটা একটু কষ্টসাধ্যই হয়ে যায়। তাই এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হচ্ছে **পরিবারকে দাওয়াতের ওপর রাখতে হবে। পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ কায়েমের জন্য নিয়মিতভাবে পূর্ণ হেকমত ও দরদের সাথে ঘরে দাওয়াতের কাজ করতে হবে।** আর আল্লাহ তাআলার নিকট খুব বেশি দুআ-কান্নাকাটি জারি রাখতে হবে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে পরিবার আমাকে যত চাপই দিক না কেন, এই আযম (দৃঢ় সংকল্প) করে নিতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই আমি দ্বীন পালন ছাড়ব না। হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাব না। হজরত বেলাল (রাঃ), হজরত খাব্বাব (রাঃ)—তাদেরকে দ্বীনের জন্য যতটা নির্যাতন করা হয়েছে, আমার ওপর পারিবারিক চাপটা নিশ্চয়ই তারচেয়ে বেশি না। সুতরাং তারা যখন এমন নির্মম অত্যাচার সহ্য করে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকতে পেরেছেন, তখন পরিবারের এই সামান্য বৈরিতায় আমার জন্য দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। এভাবে আমরা নিজেরা যখন দ্বীনের ওপর মজবুত হয়ে যাব এবং নিয়মিতভাবে পরিবারকে দাওয়াত দিতে থাকব, তখন ইনশাআল্লাহ পরিবার আমাদেরকে চাপ দেওয়া বন্ধ করে দেবে। কারণ, একদিকে দাওয়াত ও দুআর কারণে আল্লাহ চান তো তাদের অন্তরেও একটু একটু করে হেদায়াতের নুর আসতে থাকবে, অপরদিকে আমার দৃঢ়তা দেখে তারাও বুঝে নেবেন যে, তার ওপর যতই চাপাচাপি করা হোক, সে আর ফিরবে না। তখন ক্লান্ত হয়ে নিজ থেকেই তারা থেমে যাবে। সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার বদৌলতে যদি আল্লাহ তাআলা গোটা আরব জাহানের দৃশ্য বলতে দিতে

পারেন, তাহলে আমার দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার ফলস্বরূপ আমার এই ছোট পরিবারটা বদলে যাওয়া খুব বেশি কঠিন তো নয়। দরকার শুধু আল্লাহ্ তাআলার দরবারে কবুল করিয়ে নেওয়া।

নানা কারণে আমাদের পরিবারও আমাদের দ্বীন পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই দ্বীনের পথে এই পরীক্ষাগুলোকে সব সময়ই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আসলে কোনো ব্যক্তি যখন ইসলামকে ভালোবসে ও দ্বীন মেনে চলতে শুরু করে, তখন তার ওপর পরীক্ষা আসবেই। পরীক্ষাবিহীন কেউই দ্বীনের পথে আসতেও পারে না, দ্বীনের সাথে লেগেও থাকতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾

'তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।'[২৫]

দ্বীনের পথে পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। তাই বিচলিত হলে চলবে না। দ্বীনের ব্যাপারে নমনীয় হওয়া যাবে না। বরং পরীক্ষা যত কঠিন ও দীর্ঘ হবে, ততই দৃঢ়তার সাথে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে হবে। মনে রাখবেন, **এর মানে এই না যে, আমরা আমাদের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব। বরং তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি নম্রতা অবলম্বন করব।** তাদের খেদমত করব। দ্বীনকেও ছাড়া যাবে না, আবার তাদের সাথেও বেয়াদবি করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা তো কাফের পিতা-মাতার সাথেও ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾

'তারা (পিতা-মাতা) যদি এমন কাউকে আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে।'[২৬]

---

[২৫] সুরা আলে-ইমরান : ১৪২।

[২৬] সুরা লুকমান : ১৫।

আল্লাহর সাথে শিরক করার জন্য চাপাচাপি করা পিতা-মাতার সাথেও আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সদ্ভাবে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে আমাদের বাবা-মায়েরা তো আর মুশরিক হয়ে যায়নি। তাই কোনোভাবেই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। আবার তাদের চাপাচাপিতে দ্বীন থেকেও সরে যাওয়া যাবে না। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, দ্বীনের বিপরীতে তাদের কোনো কথা মানা যাবে না।

ঘরে দাওয়াতের পদ্ধতি

বয়স্ক মানুষের স্বাভাবিকভাবেই আখেরাতের প্রতি আগ্রহ কাজ করে। যদি দ্বীন একবার বুঝে ফেলে তাহলে তাদের জন্য দ্বীনের ওপর চলা অনেক বেশি সহজ। এখন কথা হচ্ছে তাদেরকে আমরা দাওয়াত দেবো কীভাবে? পরিবারে দ্বীনের দাওয়াত কীভাবে দিতে হয়, এটা নিয়ে আমার একটা আলাদা লেখা আছে। 'কুররাতু আইয়ুন' বইয়ে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। সেখান থেকে পড়ে দেখতে পারেন। এ ছাড়াও আমাদের Mashwara Official পেইজে চলমান দাওয়াহ কোর্সে এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

নিজের বাবা-মায়ের ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সরাসরি মৌখিকভাবে নসিহা না করে অন্য কোনো সিনিয়র আলেম বা বড় কাউকে ঘরে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এরপর তাঁর মাধ্যমে মা-বাবাসহ পরিবারের অন্যান্য লোকদের নসিহা করাতে হবে। উপদেশ-নাসিহার কথা বাবা-মা সাধারণত সন্তানের মুখ থেকে শুনতে পছন্দ করেন না।

- এ জন্য সিনিয়র কাউকে দিয়ে বা বাবার বয়সি কাউকে বাসায় নিয়ে এসে তার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে পারলে তা বেশি কাজ দেয়।
- বাবা-মাকে ভালো কোনো আলেমের আলোচনার লিংক দেওয়া যেতে পারে, কখনো কোনো আলেমের মজলিসে নিয়ে যেতে পারলে তো খুব ভালো হয়।
- বাসায় তালিমের মজলিস চালু করা যায়। বাবা-মাকে প্রতিদিন দ্বীনি বইপত্র থেকে কিছু পড়ে শোনানো যেতে পারে।

এ বিষয়গুলো করা খুবই জরুরি। বয়স্ক মানুষেরা সাধারণত মনে করে যে, তারা দুনিয়ার সবকিছু বুঝে ফেলেছেন। যার কারণে তাদেরকে নতুন করে কোনো বুঝ

দেওয়া কঠিন। বাকি আমাদের চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখা যাবে না। জীবনের এ সময়টাতে এসে দ্বীন-ধর্মের প্রতি এমনিতেই তাদের মন নরম থাকে। দেখা যাবে সামান্য মেহনতেই তারা দ্বীনের ওপর উঠে যাবে। যৌবনের যে গুনাহগুলোর কারণে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, তাদের বেলায় সাধারণত সেই সমস্যাটা থাকে না। তাই বয়স্কদের যদি একবার কোনোভাবে দ্বীনে উঠানো যায়, আশা করা যায় তারা খুব সহজেই ঈমানি হালতে পরকালে পাড়ি জমাতে পারবে। কারও কারও ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে নিকটস্থ বিজ্ঞ আলেম ও অভিজ্ঞ দ্বীনদারদের সাথে পরামর্শ করে আগে বাড়তে হবে।

পরিবারে দাওয়াহ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে, দ্বীনের খুঁটিনাটি সবকিছু মা-বাবা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবেন না। পর্দার বিধান, মাহরাম-গাইরে মাহরামের বিধান, ব্যবসার হালাল-হারাম—এসব বিষয়ের আলোচনা সাধারণত বাবা-মা নিজের সন্তানের থেকে গ্রহণ করতে আগ্রহী থাকেন না। এটা স্বাভাবিক সাইকোলজি। এর সহজ সমাধান হলো, বাসায় তালিম চালু করে দিন। সাধারণদের জন্য সংকলিত হাদিসের কিতাবগুলো থেকে তালিম করুন। হাদিস থেকে পড়বেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের কথাটা মা-বাবাকে শোনাবেন। এভাবে প্রতিদিন করতে করতে একটা সময় মায়ের মাঝে বুঝ আসবে। দেখবেন, বাবা ঘরের তালিমে শোনা অনেক বিষয় মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেব থেকে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিচ্ছেন। এভাবে তারা আস্তে আস্তে পুরোপুরি দ্বীনে চলে আসনবে ইনশাআল্লাহ।

আরেকটা জরুরি বিষয় হচ্ছে, চেষ্টা করতে হবে অন্যান্য দ্বীনি মহিলাদের সাথে নিজের মাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। অনুরূপভাবে বাবাকেও মাঝে মাঝে মসজিদের তালিমে বসিয়ে দিতে হবে। একসময় মজা পেয়ে গেলে তিনি নিজ থেকেই কন্টিনিউ করবেন। মসজিদের তালিমে বসার দ্বারা দ্বীনদার লোকদের সাথে বাবার পরিচয় ও সখ্যতা গড়ে উঠবে। এভাবে দ্বীনদারদের সংস্পর্শে এলে তাদের জন্য দ্বীন মানা সহজ হয়ে যাবে।

আমরা পরিবার থেকে দূরে থাকি। তো দূরে থেকেও পরিবারে দাওয়াতি কাজ করা যায়। যেমন,

ক. বাসায় দ্বীনি বইপত্র কিনে দেবেন।

খ. ছোট ভাই-বোনদের মাধ্যমে ঘরের তালিম অব্যাহত রাখা যায়।

গ. গ্রহণযোগ্য আলেমদের আলোচনার লিংকগুলো এবং বিভিন্ন শায়খের গুরুত্বপূর্ণ নাসিহার লিংকগুলো দেওয়া যায় বাবা-মাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে।

ঘ. ফোনে বাবা-মায়ের নামাজ ইবাদতের খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।

ঙ. সম্ভব হলে কোনো উস্তাযার মাধ্যমে ঘরে কুরআন শিক্ষার দরস চালু করে দিতে পারলে অনেক বেশি ফায়দা হবে।

দ্বীনি ভাই-বোনদের খারাবিগুলোকে দ্বীনের খারাবি মনে করা

আমরা যখন দ্বীনের পথে আসি তখন দ্বীনি ঘরানার অনেকের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। অনেক দ্বীনি বন্ধুবান্ধবের সাথে আমাদের উঠাবসা হয়। এরপর তাদের কিছু খারাপ দিক যখন আমাদের চোখের সামনে চলে আসে, তখন আমরা এটাকে ইসলামের খারাবি হিসেবে গ্রহণ করে নিই। এটা বড়ই ভুল এপ্রোচ। দেখুন, আমি এখন যে কথাটি বললাম এর বাস্তবতা আছে। বেশ কয়েকজন নাস্তিকের সাথে আলাপচারিতা থেকে আমি এটা বুঝতে পেরেছি। তাদের অনেকের একটা অভিযোগ ছিল এমন যে, 'কত বড় বড় বড় দ্বীনদারকে দেখলাম, কী সব মারাত্মক মারাত্মক অপরাধ করে বেড়াচ্ছে। আমরা নাস্তিকরাও তো এমন কাজ করি না। তোমাদের বড় বড় দ্বীনদাররা যে কতটুকু দ্বীন মানে তা জানা আছে।'

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা মূলত দ্বীন পালনকারী কোনো ব্যক্তিবিশেষের দোষ দ্বারা পুরো ইসলামকে দোষারোপ করতে চাচ্ছে। মানে বোঝাতে চাচ্ছে যে, এ কারণেই তারা ইসলামকে বর্জন করেছে। এটা তাদের একটা কৌশল বা চতুরতাও হতে পারে। আবার এর বাস্তবতাও থাকতে পারে। কেননা মানুষ অনেক সময় একজন ব্যক্তির দোষে তার পুরো বংশ, পরিবার, এমনকি তার জাতি ও দেশকেও দোষারোপ করে থাকে। অথচ এটা তো স্বীকৃত বিষয় যে, একজন ব্যক্তি খারাপ বলে তার পুরো বংশ, পরিবার খারাপ হওয়া জরুরি না। আর এমনটা হবেও না। তাই নতুন দ্বীনে আসা কোনো ভাই-বোনের বেলায়ও এমনটা হতে পারে যে, দ্বীনে আসার পর কোনো দ্বীনি ভাই-বন্ধুর খারাবিকে সে ইসলামের খারাবি হিসেবে ধরে নিলো। আর এর ফলে সে দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে থাকল।

তাই বলছি, দ্বীনি ভাই-বোনদের খারাপ কিছু চোখে আসতেই পারে। শয়তান তো সবার পেছনেই লেগে আছে। নফসের আক্রমণ থেকে কে নিরাপদ? এ কারণে তো আর ইসলাম খারাপ হয়ে যাবে না। ইসলামের তো এখানে কোনো দায় নেই। বরং ইসলাম তো অপরাধীদের জন্য শাস্তির বিধান রেখেছে। অপরাধ অনুযায়ী প্রতিটি অপরাধেরই দুনিয়াবি ও পরকালীন শাস্তির বিধান দিয়েছে। অন্যায় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং গুনাহ থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করেছে। তাই ইসলাম মূলত কী? সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। দ্বীনে আসার পর আমাদেরকে দ্বীনের মৌলিক ইলম অর্জন করতে হবে। কিন্তু হতাশাজনক বাস্তবতা হচ্ছে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের কোনো ঝোঁকই নেই। ইলম বলতে এখন আমরা শুধু কিছু মতানৈক্যপূর্ণ মাসায়েল ও তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে বুঝি। এটা আরেক সমস্যা। যাইহোক, বলছিলাম দ্বীনি ভাই-বোনদের যে খারাপ দিকগুলো রয়েছে সেটা তাদের নিজস্ব সমস্যা, নিজস্ব বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা। তার দোষের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্য দ্বীনদার কোনো ব্যক্তিকে অন্যায় করতে দেখলে সে জন্য আমার দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ইতিহাসের পাতায় অনেক বড় বড় আল্লাহওয়ালাদের পর্যন্ত পদস্খলিত হয়ে মারাত্মক ধরনের অপরাধে জড়িত হওয়ার ঘটনা লিখিত আছে। সে জন্য কি এখন আমি দ্বীন ছেড়ে দেবো?

আসলে ইসলাম তো হলো পরশপাথর। যে-ই এর সংস্পর্শে আসবে, খাঁটি সোনায় পরিণত হবে। এখন যে তার জীবনের যতটুকু অংশে ইসলামের ছোঁয়া লাগাবে, ততটুকুই তো সোনা হবে, আর জীবনের যে অংশকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, সেই অংশ তো মাটি-ই থেকে যাবে। তাই দ্বীনি ভাইর ভালোটুকুতে তুমি ইসলামের সৌন্দর্যকে অবলোকন করো। আর তার মন্দের মাঝে তুমি ইসলামের শূন্যতাকে অনুধাবন করো। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো যে, তুমি নিজ জীবনের সকল অংশকেই ইসলামের ছোঁয়া দ্বারা সোনায় পরিণত করবে।

গোপন গুনাহের ওপর অটল থাকা

মানুষ হিসেবে সবারই কিছু না কিছু গোপন গুনাহ থাকে। তার ওপর ইন্টারনেট, স্মার্টফোনের এই যুগে গোপন গুনাহ বেঁচে থাকাও কঠিন। কথা হচ্ছে গোপনে

এসব গুনাহে লিপ্ত হওয়া যাবে না। সব সময় আল্লাহ তাআলার স্মরণ অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে। আমি তো মানুষের ভয়ে দ্বীনে আসিনি যে, মানুষের অন্তরালে গেলেই গুনাহে জড়িয়ে যাব। এ কথা মনে জাগ্রত রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, তিনি আমার মুখে উচ্চারিত ও অন্তরে লুক্কায়িত সব কথা শুনছেন, তিনি আমার সকল অবস্থা সম্পর্কে সব সময় অবগত আছেন। এভাবে নিজেকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করাই হবে প্রথম কাজ। তারপরেও কখনো যদি আমার দ্বারা গোপনে কোনো গুনাহ হয়েও যায়, তবে সেই গুনাহের ওপর অটল থাকা যাবে না। **বস্তুত প্রত্যেক গোপন গুনাহের পর শয়তান মানুষের ওপর নিজের অবস্থানকে আরও শক্ত করে নেয়। তাই শয়তানকে সুযোগ দেওয়া যাবে না।** বরং সাথেসাথেই কৃত গুনাহের ওপর অনুতপ্ত হয়ে মন থেকে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ফিউচারে আর কখনো এই গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। গুনাহ আমাকে ছাড়তেই হবে। কেননা গুনাহের কারণে অন্তর থেকে হেদায়াতের নুর চলে যেতে থাকে। যে ব্যক্তি বারংবার গুনাহ করতে থাকে, তার কলুষিত হয়ে যায়। হাদিসে এসেছে, প্রত্যেকবার গুনাহ করার কারণে বান্দার অন্তরে একটা করে কালো দাগ পড়ে যায়। এভাবে বারবার গুনাহ করার দ্বারা তার অন্তরের কালো দাগ বাড়তে থাকে। একসময় তার পুরো অন্তরই একদম কালো হয়ে যায়। তখন সেই অন্তরে আর হেদায়াতের নুর অবশিষ্ট থাকে না। এই অবস্থা হয়ে যাওয়ায় তার কাছে আর দ্বীন পালন ভালো লাগে না। সে হেদায়াত থেকে বের হয়ে যায়।

তাই করণীয় হচ্ছে, আমাদেরকে তাওবা-ইস্তেগফার করতে থাকতে হবে। আসলে এ যুগে গুনাহ থেকে আমরা কেউ নিরাপদ না। জানে-আনজানে গুনাহ তো হতেই থাকে। তাই চলতে-ফিরতে ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত। তাওবার ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকায় পড়া যাবে না। অনেক সময় এমন হয়, কোনো একটা গুনাহ থেকে বিশ-পঁচিশবার তাওবা করার পরও পুনরায় সেই গুনাহ হয়ে যায়। তখন শয়তান এমনভাবে তাকে ধোঁকা দেয় যে, সে ধরেই নেয় এই গুনাহ থেকে বুঝি সে আর কখনো মুক্ত হতে পারবে না। এমনকি এক পর্যায়ে গিয়ে সে তাওবা থেকেও নিরাশ হয়ে যায়। তখন সে ওই গুনাহ থেকে আর তাওবা পর্যন্ত করে না। মনে রাখবেন, এরচেয়ে ধ্বংসাত্মক আর কিছু হতে পারে না। বান্দা যদি হাজারবারও কোনো গুনাহ করে ফেলে, এরপরও তার করণীয় হচ্ছে সেই গুনাহ থেকে তাওবা করা এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া। কেননা গুনাহ নিয়ে কবরে গেলে আর রক্ষা নেই। এদিকে গুনাহ হয়েই যায়।

সুতরাং তাওবা-ইস্তেগফার ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বান্দার জন্য তাওবার দরজাকে উন্মুক্ত রেখেছেন। আর বান্দার জন্য আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে হারাম করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

‘বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[২৭]

শায়খ উমায়ের কোব্বাদি হাফিযাহুল্লাহ বলেন, ‘তাওবার অভ্যাস থাকতে হবে, একদম পরিপূর্ণ তাওবার অভ্যাস। তাহলে একটা পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ পরিত্যাগ করার শক্তি দান করবেন, গুনাহ ছাড়ার তাওফিক দেবেন।’

তাই দুটি কাজই একসাথে চালিয়ে যেতে হবে।
এক. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।
দুই. সর্বদা তাওবা-ইস্তেগফার করতে থাকা।

তাহলেই শয়তান আমাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে। অন্যথায় তাওবা ছেড়ে দিয়ে গুনাহে ডুবে থাকলে কখনো আমরা দ্বীনের ওপর অটল থাকতে পারব না। গুনাহের কারণে সর্বপ্রথম আমরা ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হব, নেক আমলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলব, অন্তর মরে যাবে, দিল শক্ত হয়ে যাবে, চোখ আর অশ্রুসিক্ত হবে না, এক পর্যায়ে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের মনে নানা সংশয় তৈরি হতে থাকবে, আমাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যাবে, আর সব শেষে আমরা হেদায়াতের আলো থেকে বের হয়ে গোমরাহির অন্ধকারে তলিয়ে যাব। তাই গুনাহের ব্যাপারে খুব সাবধান। কোনো গুনাহকে ছোট করে দেখা যাবে না। সবটা থেকেই বেঁচে থাকতে হবে। আর তাওবাকে জবানে জারি করে নিতে হবে।

---

[২৭] সুরা যুমার : ৫৩।

গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই বইগুলো পড়তে পারেন,

- মুক্ত বাতাসের খোঁজে (ইলম হাউজ)
- আকাশের ওপারে আকাশ (ইলম হাউজ)
- মুক্তি সম্ভব (সপ্তশীষ)
- এখন যৌবন যার (উমেদ প্রকাশ)
- লজ্জা ঈমানের একটি শাখা (ওয়াফি)
- ঈমান পরিচর্যা (ওয়াফি)
- গুনাহ মাফের উপায় (ইয়াকীন)
- গুনাহ থেকে ফিরে আসুন (আয়ান)

এই বইগুলো পড়ার দ্বারা আমাদের মাঝে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে, গুনাহ ছাড়ার হিম্মত তৈরি হবে, অন্তরে নেক আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের অন্যান্য বইগুলোও পড়া যেতে পারে।

এখন আমি কিছু কাজের কথা বলছি, যার ফলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

ক. আল্লাহর আজমত ও বড়ত্ব এবং নিজের ক্ষুদ্রতা নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করা।

খ. আল্লাহওয়ালাদের সোহবত নেওয়া, তাদের সাথে প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে সপ্তাহে, মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

গ. একাকীত্ব বা নির্জনবাস পরিহার করা। অবসর সময়গুলো বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোনদের সাথে কাটানো।

ঘ. ব্যস্ততাপূর্ণ জীবন পরিচালনা করা। অবসর যেন পেয়ে না বসে কখনোই। ব্যস্ত যত থাকা হবে, শয়তান ততই গুনাহ করানোর সুযোগ কম পাবে।

ঙ. মোবাইলের ক্ষেত্রে এন্ড্রয়েড থেকে বাটন ফোনে শিফট হতে পারলে সবচেয়ে উত্তম। যদি এন্ড্রয়েড ব্যবহার করতেই হয়, তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ফোনের স্ক্রিনে ব্যয় না করা। আর যতক্ষণ আমি ফোনের সাথে আছি, আমার অন্তরে যেন আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে। তাহলে শয়তান ধোঁকা দিতে পারবে না।

চ. একই গুনাহ হাজারবার করে ফেললেও প্রত্যেকবার আগের তুলনায় অধিক নতজানু ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। শয়তান যেন আমাদের তাওবা-ইস্তেগফার থেকে গাফেল রাখতে না পারে। সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা যে, তিনি আমার তাওবা কবুল করবেন।

ছ. সর্ব হালতে অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়কে অনুভব করা। এ কথা চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন, তিনি আমার সবকিছু শোনেন ও জানেন।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করব যেভাবে

আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য এই কাজগুলো করা যেতে পারে,

ক. আলেম-উলামা ও আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থাকা। এর ফায়দা বলে শেষ করা যাবে না। এখন তো অনলাইনে অনেক বড় বড় আল্লাহওয়ালাদের আলোচনা খুব সহজে পাওয়া যায়। তাই অনলাইনে তাদের আলোচনা শোনা। তাদের বাতলানো ইসলাহি নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা। এই তালিকায় শায়খ উমায়ের কোব্বাদি হাফিযাহুল্লাহ, মাওলানা শরিফ মুহাম্মাদ, মাওলানা মুশতাকুন্নবী সাহেব, আবুল বাশার সাইফুল ইসলাম সাহেব (হাফিযাহুমুল্লাহ)-সহ প্রমুখদের নাম থাকতে পারে। যাদের আলোচনায় অন্তর বিগলিত হয়, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়, নেক আমলের আগ্রহ বাড়ে। এমন ব্যক্তিদের আলোচনা শোনার দ্বারা ঈমানি স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে।

খ. বোনেরা Islamic Online Madrasha-এর সিস্টারস কমিউনিটির সাথে যুক্ত থাকতে পারেন।

গ. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির অনেক বই রয়েছে। দৈনন্দিন পাঠ্যতালিকায় সেখান থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করা। যেমন, কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হবো, যাদুস সালেকীন, মাদারিযুস সালেকিন, ইসলাহি খুতুবাত, ইসলাহি মাজালিস, ইসলাহি নেসাব, গুনাহে বে-লজ্জত, অশ্রুসাগর ইত্যাদি।

ঘ. নফল আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। নফল সালাত, নফল সিয়াম, নফল সাদাকা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি আমলের মধ্যে সময় কাটানো।

নিজের ইলম-আমল নিয়ে অহংকার

দীর্ঘদিন দ্বীনের পথে থাকতে থাকতে নিজের মধ্যে একধরনের অহংকার চলে আসতে পারে। অহংকার বড়ই ধ্বংসাত্মক জিনিস। যার মধ্যে অহংকার জন্ম নিয়েছে তার ধ্বংস অনিবার্য। কোনো দ্বীনদার ব্যক্তির মাঝেও যদি তার দ্বীন মানার কারণে অহংকার চলে আসে, নিশ্চিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। তার হেদায়াত কেড়ে নেবেন। অনেক বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তিরা পর্যন্ত এই আজাব থেকে রেহাই পাননি। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, অহংকার হলো আল্লাহর চাদর। আর যে তাঁর চাদর নিয়ে টানাহেঁচড়া করে (অর্থাৎ, সে নিজে অহংকার করে), আল্লাহ তাআলা তার থেকে হিসাব নেওয়া ছাড়াই তাকে জাহান্নামে দেবেন।[২৮]

এ কথা সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে, শয়তান কাউকে হেদায়াত থেকে বের করতে পারে না। হেদায়াত দেনও আল্লাহ তাআলা, আবার হেদায়াত কেড়েও নেন আল্লাহ তাআলা। বান্দাকে পথভ্রষ্ট করার কোনো ক্ষমতাই শয়তানের নেই। শয়তানের ক্ষমতা শুধু ওয়াসওয়াসা দেওয়ার। শয়তান বান্দাকে ধোঁকা দিয়ে ভুল পথে প্ররোচিত করতে পারে, মন্দ কাজের কুমন্ত্রণা দিতে পারে, কিন্তু কাউকে মন্দ কাজে লিপ্ত করার ক্ষমতা তার নেই।

আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ যখন বান্দার নাফরমানির কারণে বান্দার ওপর থেকে স্বীয় রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নেন এবং বান্দাকে তাঁর হেফাজত থেকে বের করে দেন, তখনই বান্দা শয়তানের কুমন্ত্রণার কাছে পরাজিত হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা আল্লাহ তাআলার হেফাজতে থাকে, তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানের শত প্রচেষ্টা তাকে পরাজিত করতে পারে না। বরং শয়তানই বারবার তার কাছে পরাজিত হতে থাকে। সুতরাং বান্দার মাঝে যখন অহংকার জন্ম নেবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকে স্বীয় হেফাজত হতে বের করে দেবেন, তার থেকে স্বীয় রহমত সরিয়ে নেবেন। আর তখনই বান্দা শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। তাই অহংকারকে কখনো মনের মাঝে স্থান দেওয়া যাবে না। বান্দা যদি অহংকারমুক্ত থাকে, তাহলে কখনো টুকটাক গুনাহ হয়ে গেলেও আল্লাহ তাআলা তাকে তাওবা করার তাওফিক দেবেন। আল্লাহর রহমত তাকে আল্লাহর মাগফিরাতের দিকে টেনে নেবে।

---

[২৮] আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৩।

আসলে নিজের দ্বীনদারি নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই। কারণ, আমি আগেই বলেছি, আমাদের এই দ্বীন মানার তাওফিক এটা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি তার বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র। এখানে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, সম্পদ, স্বাস্থ্যের কোনো অবদান নেই। বরং আমাদের আপাদমস্তক তো অযোগ্যতায় ভরা। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহ নিয়ে আমাদের অহংকার করার কিছু নেই। অনেক সময় নেক সুরতে আমাদের থেকে অহংকার প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন, একদিন আমি তাহাজ্জুদ পড়লাম, তো পরের দিন যার সাথে দেখা হয় তাকেই জিজ্ঞেস করতে থাকলাম যে, সে তাহাজ্জুদ পড়েছে কি-না। সাথে হালকা করে এটাও জানিয়ে দিলাম, আমি তো নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ি। এরপর এমন একটা ভাব নিলাম যে, তাহাজ্জুদ ছাড়া ব্যক্তির আবার দ্বীনদারি বলতে কিছু থাকে নাকি! এই তো আমার থেকে তাহাজ্জুদের অহংকার প্রকাশ পেয়ে গেল।

কিংবা ধরুন, আমাদের কোনো এক বন্ধু নামাজ পড়ে না। তো আমরা দাওয়াতের নামে সব সময় তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে থাকলাম, অনেকটা অপমানের স্বরেই তাকে নানাভাবে খোঁচাতে থাকলাম। এটাও কিন্তু অহংকার। মনে রাখবেন, দাঈ হবে বিনয়ী। তার কথায় থাকবে নম্রতা। উগ্রতা ও অহংকার কখনো দাঈর বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে কাউকে তার গুনাহের জন্য উঠতে-বসতে লজ্জা দেওয়া যাবে না। আমরা তাকে গুনাহ ছাড়ার দাওয়াত দেবো। কিন্তু তাকে অপমান করব না। আমি কীভাবে একজনকে তার গুনাহের জন্য অপমান করতে পারি, অথচ আমার গোপন গুনাহ সম্পর্কে মানুষ জানলে আমার দিকে থুথু ছিটাত। সুতরাং আল্লাহ দয়া করে আমার গুনাহ গোপন রেখেছেন বলে আমি অন্যদের সামনে বড় বুজুর্গির ভাব নেবো, আর অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করব, এটা তো হতে পারে না।

এ জন্য আমাদের তাবলিগের মুরুব্বিরা অনেক সময় আমাদের বেশ চমৎকার চমৎকার ও শিক্ষণীয় বিষয় শেখান। যেমন, এসব ক্ষেত্রে তারা আমাদের এভাবে বলেন যে, যখন তোমার চেয়ে বয়সে বড় কোনো ব্যক্তি তোমার সামনে আসবে, তখন তুমি মনে করবে যে, ইনি তো আমার চাইতে বেশি সময় দুনিয়াতে অবস্থান করেছেন, সুতরাং তার আমল আমার চেয়ে অনেক বেশি। তাই তিনি আমার সম্মানের পাত্র। আর যখন বয়সে ছোট কেউ তোমার সামনে আসবে, তখন মনে করতে হবে যে, সে দুনিয়ায় আমার চেয়ে কম সময় অবস্থান করেছে, সুতরাং তার পাপের পরিমাণ আমার চেয়ে কম। আর আমার পাপ তারচেয়ে বেশি। তাই সে-ও আমার কাছে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

সুবহানাল্লাহ, কত সুন্দর কথা! এভাবে চিন্তা করতে পারলে কখনো মনের মাঝে অহংকার আসতে পারবে না। আমি যখন সবাইকে আমার চেয়ে বেশি সম্মানিত মনে করব, তখন আমার আর অহংকার করার জায়গা কোথায়? তাই নিজের ব্যাপারে মনে করতে হবে যে, আমি হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাপী। আমার সামনের যে ভাইটা এখন নামাজ পড়ছে না, সে যদি কালকে থেকে নামাজ শুরু করে, তাহলে সে আমার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে তাকে নিজের ওলি বানিয়ে নেবেন। এদিকে আমার তাওবা কবুল হয়েছে কি না, আমার নামাজ-রোজা, ইবাদতসমূহ আল্লাহর নিকট কবুল হয় কি না, তার কিছুই আমার জানা নেই।

দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া

আমরা অনেক সময় দুনিয়ার পেছনে পড়ে আখেরাত হারিয়ে ফেলি। হেদায়াত থেকে সরে যাই। ধরুন দাড়ির জন্য কেউ ভালো চাকুরি পাচ্ছে না, তখন সে দাড়ি কেটে ফেলল। অনেককে দেখা যায় নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করবে বা বর্তমানের ব্যবসাটাকে আরেকটু ভালোভাবে শুরু করতে চাচ্ছে, কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত টাকা নাই, তখন সে ব্যাংক থেকে সুদে লোন নিয়ে নিলো। বোঝা যাচ্ছে দুনিয়া উপার্জনের তাড়নায়ও হেদায়াত হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে।

আমরা ভুলে যাই যে, রিজিক পূর্বে থেকেই বণ্টনকৃত। কেউ দুনিয়া থেকে সে পরিমাণই পাবে, যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে। তাই দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে ছেড়ে দেওয়া বোকামি। বরং কেউ যখন দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর খুব বেশি প্রাধান্য দেয়, সে দুনিয়া-আখেরাত দুটোই হারায়। মনে রাখতে হবে, রিজিকদাতা আল্লাহ। অতএব, যে আল্লাহকে খুশি না করে হারামের দিকে চলে যাবে, আল্লাহ তাকে হেদায়াত থেকে বের করে দেবেন। তখন সে দুনিয়ার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাবে যে, সে বুঝতেও পারে না সে কি নেয়ামত লাভ করছে নাকি আজাবের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। তার পেরেশানি এত বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয় ঠিকমতো, খাবার খাওয়ার সময়টুকু পায় না। এই আজাব থেকে সে আর কখনো উঠতে আসতে পারে না। তার হাতে টাকা থাকে কিন্তু মনে শান্তি থাকে না। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, দুনিয়া পুরোটাই একটা ধোঁকা। একবার যে

দুনিয়ার চাকচিক্যের ধোঁকায় পড়ে যাবে, তার দ্বীন-ধর্ম সব বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾

'আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।'[২৯]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

'কিছু লোক তো এমন আছে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আর আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই।'[৩০]

দুনিয়া সম্পর্কে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.

'নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ (সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত করে দেখবেন যে, তোমরা কীভাবে আমল করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচো এবং নারীর (ফেতনা থেকে) বেঁচে থাকো।'[৩১]

হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হয়েছে,

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى.

'দুনিয়া অভিশপ্ত। এর মধ্যস্থিত সকল বস্তুও অভিশপ্ত। তবে যে কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় তা অভিশপ্ত নয়।'[৩২]

---

[২৯] সূরা আলে-ইমরান : ১৮৫।
[৩০] সূরা বাকারা : ২০০।
[৩১] সহিহ মুসলিম : ২৭৪২।
[৩২] আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব : ৯।

দ্বিতীয় পর্ব

হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত

হেদায়াত পাওয়ার পর তা আবার কেন হারিয়ে যায়—এই বিষয়টা অনেক গুরুগম্ভীর। গুরুগম্ভীর বলছি এ কারণে যে, আমরা যারা এ বিষয়ে আলোচনা করি, আমরা নিজেরাই আসলে কতটা হেদায়াতের ওপরে আছি—এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কথা আমাদের বারবার স্মরণে রাখা চাই যে, আমরা নিজেরা কতটুকু পরিমাণ হেদায়াতের ওপর উঠতে পেরেছি। এটাকে পেছনে রাখার কোনো সুযোগই নেই। দেখুন, আমাদের লেবাস-বেশভূষার কারণে মানুষ তো আমাদেরকে দূর থেকে অনেক কিছুই মনে করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এ জন্য পাঠকের কাছে আরজ হলো, কথাগুলো কে বলছে সেটা না দেখে, কী কথা বলা হচ্ছে সেদিকে যদি আমরা মনোযোগ দিই, তাহলে বেশি ভালো হবে। আরবিতে সুন্দর একটা উক্তি আছে,

انظر الى ما قال، و لا تنظر الى من قال.

'বক্তার দিকে না দেখে বক্তব্যের দিকে মনোযোগ দাও।'

মূলত হেদায়াত একটা ব্যাপক বিষয়। বান্দা যখন হেদায়াতের ওপর ওঠে তখন তার পুরো লাইফস্টাইলেই একটা পরিবর্তন আনতে হয় এবং সেই পরিবর্তন দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে, লোকটা হেদায়াতের দিকে আসছে। হেদায়াতের ওপর আসা যেমন জরুরি, তেমনই হেদায়াতের ওপর ইস্তিকামাত অর্জন করা, মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা আরও বেশি জরুরি। হাদিস শরিফে এসেছে,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

'নিশ্চয়ই আমলের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর।'[৩৩]

এই বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করে এখানে আমরা হেদায়াতের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য তিনটি করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করব :

এক. সর্বদা দুআ করতে থাকা।

বস্তুত হেদায়াত এমন একটি নেয়ামত, যার লাইফটাইম কোনো গ্যারান্টি নেই। আমরা দেখি যে, পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এটা দুআ শিখিয়েছেন,

---

[৩৩] সহিহ বুখারি : ৬৬০৭।

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দান করেছ তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই মহাদাতা।'[৩৪]

এই দুআর দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পারব যে, এই দুআটিই ইঙ্গিতে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে মানুষের হেদায়াতের লাইফটাইম কোনো গ্যারান্টি নেই। বরং মানুষ হেদায়াতের ওপর এসে পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যেতে পারে। তার অন্তরে নতুন করে বক্রতা সৃষ্টি হতে পারে। স্বীয় গুনাহের কারণে সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে পারে। আর এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে হেদায়াত লাভের পর সেই হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার জন্য তাঁর নিকট দুআ করা শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর মহান দরবারে রহমতের জন্য প্রার্থনা করতে বলছেন।

আজকে আমরা যারা হেদায়াতের ওপর আছি, আগামীকালও যে এর ওপর অবিচল থাকতে পারব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজকে আমরা যারা টুটাফাটা দ্বীন মেনে চলার চেষ্টা করছি, এক বছর পরও যে সেটা পারব তারও কোনো শিওরিটি নাই। উপর্যুক্ত দুআটির দিকে আবার লক্ষ করুন, এই দুআতে আল্লাহ তাআলার নিকট কী চাওয়া হচ্ছে? আমরা বলছি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দিয়েছেন, সুতরাং এরপরে আপনি আমাদের অন্তরকে আবার বক্র করে দিয়েন না, সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে আমাদের সরিয়ে দিয়েন না। আপনি তো মহাদাতা, সুতরাং আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত দান করুন। কেননা আপনার রহমত আমাদের ওপর না থাকলে আমাদের কোনো সাধ্য নেই যে, আমরা হেদায়াতের ওপর থাকতে পারব। বোঝা গেল এই আয়াতই আমাদের বলে দিচ্ছে যে, আমাদের হেদায়াতের কোনো নিশ্চয়তাই নেই। যদি থাকত তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই এভাবে দুআ করা শিক্ষা দিতেন না। তার মানে আমরা কেউই শঙ্কামুক্ত নই। হেদায়াতপ্রাপ্তির পর পুনরায় হেদায়াত থেকে বের হয় গেছে এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে অনেক। তাই আমরা যেন সতর্ক হই এবং আমাদের বেলায়ও যেন

---

[৩৪] সুরা আলে-ইমরান : ৮।

এমনটা না ঘটে, সে জন্য আল্লাহর আমাদেরকে দুআ শেখাচ্ছেন এবং সেই দুআটা কীভাবে করতে হবে সেটাও তিনি নিজে আমাদেরকে বাতলে দিচ্ছেন।

সুতরাং প্রথম কথা হলো হেদায়াতে আসার পর নিজের হেদায়াতকে লাইফটাইম গ্যারান্টি হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না। আল্লাহ একবার আমাদেরকে দয়া করে হেদায়াতের নেয়ামত দান করেছেন। এখন এই নেয়ামতের কদর করা ছাড়াই তা আমৃত্যু আমাদের নিকট সুরক্ষিত থেকে যাবে এবং আমরা হেদায়াতের ওপর বহাল থেকেই দুনিয়া ত্যাগ করতে পারব—এটা মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে। কারও কাছে যখন কোনো মূল্যবান বস্তু থাকে তখন সে নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। সব সময় একটা শঙ্কার মধ্যে থাকে যে, তার সেই মূল্যবান বস্তুটি আবার হারিয়ে না যায়, কিংবা কেউ আবার তা চুরি করে নিয়ে যায় কিনা। এই যে এক ভয়—এই ভয় থেকেই সে তার মূল্যবান সম্পদের হেফাজতের ব্যাপারে সচেতন হয়, কীভাবে তা সুরক্ষিত রাখা যায় সেই চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে আমরাও যখন অনুধাবন করতে পারব যে, আমাদের এই হেদায়াত আমাদের নিকট আল্লাহপ্রদত্ত এক মহা মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদের দিকে নিবিষ্ট রয়েছে ডাকাতের চোখ। যেকোনো মুহূর্তে তা হারিয়ে যাওয়ার হাজারো আয়োজন চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের মাঝে সচেতনতা তৈরি হবে। সেইসাথে নিজেদের দুর্বলতার উপলব্ধি থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর সাহায্য ও রহমত প্রার্থনার দিকেও ধাবিত হব। সুতরাং কুরআনে বর্ণিত এই দুআটি আমাদের সকলেরই মুখস্থ করে নেওয়া উচিত। যাতে করে কুরআনি বাক্য দ্বারাই আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের হেদায়াত চেয়ে নিতে পারি।

হাদিস শরিফেও হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোও মুখস্থ করে নেওয়া উচিত। যেমন,

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন,

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

‘হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহকে আবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যের ওপর আবর্তিত করুন।’[৩৫]

এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দুআ করেছেন,

يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

---

[৩৫] সহিহ মুসলিম : ৬৬৪৩।

'হে অন্তরসমূহের স্থিরতা দানকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দ্বীনের ওপর স্থির রাখুন।'[৩৬]

দুই. সঙ্গ পরিবর্তন করা

হেদায়াত লাভের পর আমাদের বাহ্যিক বেশভূষা, ইবাদত-বন্দেগি ইত্যাদি বিষয়গুলোতে বড় ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশেষ একটা জায়গা আমরা অনেকেই পরিবর্তন করতে পারি না। সেটা হচ্ছে সঙ্গ পরিবর্তন করা, বন্ধুমহল পরিবর্তন করা। এটা একটা বড় সমস্যা। শুধু এই জায়গাটা পরিবর্তনের অভাবে আমাদের অনেকেই সাময়িক ও স্থায়ীভাবে হেদায়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। হেদায়াত লাভের আগে ব্যক্তির যে ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল, যাদের সাথে সে সময় কাটাত, যেভাবে সময় কাটাত, যেখানে গিয়ে সময় কাটাত, হেদায়াতে আসার পরেও যদি সবকিছু সেই আগের মতোই থাকে, তাহলে এই ব্যক্তির জন্য হেদায়াতকে ধরে রাখা মুশকিলই বটে। তাই দ্বীন পালনে উদ্যোগী হওয়ার পর পূর্বের সেই জীবনধারার মধ্যে পরিবর্তন আনা জরুরি। এই পরিবর্তনের অভাব দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ার অনেক বড় একটি কারণ। কথায় বলে, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।

এ কারণে আমরা যদি চাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে যে হেদায়াত দিয়েছেন, দ্বীনের বুঝ দিয়েছেন, দ্বীন মানার তাওফিক দিয়েছেন—সেটা আরও স্থায়ী হোক, টেকসই হোক, আরও সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী হোক, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে সৎসঙ্গ অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখবেন, পূর্বের জীবনধারার এই পরিবর্তন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আগমন। সুতরাং এটা আমাদের পারতেই হবে। বন্ধুমহলকে খুব সচেতনতার সাথে ও যত্ন সহকারে যাচাই-বাছাই করতে হবে। কাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখব আর কাদের সাথে রাখব না—খুব ভালোভাবে বুঝে-চিন্তে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাদের ব্যাপারে মনে হবে যে, তাদের দ্বীনবিমুখতা দ্বারা আমরা প্রভাবিত হচ্ছি, যাদের কাজকর্ম-চিন্তাভাবনার প্রভাবে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের মনে সংশয় তৈরি হয়, যাদের সঙ্গকে দ্বীন পালনের পথে বাধা মনে হয়, এমন বন্ধুদের অতিসত্বর পরিহার করা জরুরি। দেখুন, আমি বলছি না যে শুধু দ্বীনদারদের সাথেই মিশতে হবে, আর যারা দ্বীন মানছে না তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। বরং স্বাভাবিকভাবে একটা সাধারণ সুসম্পর্ক তো সকল মুসলমান, বরং সকল মানুষের সাথে থাকবে। সেটা

৩৬] সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৯।

বলা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কেল মেনটেইন করার ব্যাপারে। যেই মহলের সাথে আমার দৈনন্দিন ওঠাবসা, সেটা বোঝাতে চাচ্ছি। কেননা মানুষ তার সার্কেল দ্বারা প্রভাবিত হয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে সার্কেলের কারণে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেক সময় অনেক কিছু করতে বা অনেক বিষয়ে জড়াতে বাধ্য হয়। সুতরাং এই মহল বা সার্কেল একটা ফ্যাক্ট। যদি এমন হয় যে, কোনো মহলে আপনি যাওয়ার দ্বারা আপনার দ্বীনদারির প্রভাব তাদের ওপর পড়বে, তাহলে অবশ্যই আপনি সেখানে যাবেন ও তাদের সাথে মিশবেন। কিন্তু যেখানে আপনার ওপর তাদের বদদ্বীনির প্রভাব গালেব (বিজয়ী), যেখানে আপনি তাদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করার মতো সুযোগটুকু নাই, বা দাওয়াতের সুযোগ থাকলেও অবস্থা এমন যে, তাদের দাওয়াত দিতে দিতে তাদের পরিবর্তনের আগে আপনিই তাদের মতো হয়ে যাবেন, তাহলে এমন মহল পরিবর্তন করা কত বেশি জরুরি আশা করি আপনারাও তা বুঝাতে পারছেন। তবে এটা পরিবর্তন করা একটু কঠিন। একদিনেই হুট করে সম্ভব নয়। কিন্তু সচেতনভাবে টার্গেট নিয়ে হেকমতের সাথে ধীরে ধীরে বদদ্বীনি বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এর মাঝেই কল্যাণ।

হয়তো অনেকের কাছে বিষয়টা অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, ব্যক্তির আশপাশের পরিবেশ, সঙ্গী-সাথি—যাদের সাথে সে উঠাবসা করে, যাদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, ঘুরতে যায়, যাদের থেকে নিজের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে ইত্যাদি বিষয়গুলোর মাধ্যমে কিন্তু ব্যক্তির জীবনের গতিধারা নির্ধারিত হয়, চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে পর্যন্ত এই বন্ধুমহলের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। মূলত এ জন্যই বলছি বন্ধুমহল দ্বীন-বান্ধব হওয়া জরুরি। অনেকসময় দেখা যায়, একসাথে দশ জন ঘুরতে গিয়েছে। পাঁচজন একসাথে এক গাড়িতে করে যাচ্ছে। এর মধ্যে চারজনেরই নামাজ পড়ার কোনো আগ্রহ নাই, নামাজ পড়ার কোনো প্রয়োজনও তারা অনুভব করছে না। ফলে বাকি যে একজন নামাজ পড়তে চাচ্ছে, শুধু তার একার জন্য এখন আর গাড়ি থামানো হচ্ছে না। অথবা নামাজ পড়ার জন্য যে একটা বিরতি দরকার, সেই বিরতিটা বাকি সঙ্গীরা মানতে নারাজ। ফলে কী হলো? সঙ্গীরা দ্বীনদার না হওয়ার কারণে নিয়মিত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিটিও নামাজ কাজা করতে বাধ্য হলো।

এটা তো কেবল একটা উদাহরণ। দৈনন্দিন জীবনের এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, সঙ্গীদের দ্বারা ব্যক্তি দ্বীন পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ জন্যই দ্বীনে আসার পর

নিজের হেদায়াতের স্থায়িত্বের জন্য সঙ্গ পরিবর্তন করা জরুরি। আরবিতে একটা প্রবাদ আছে,

الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ.

'মন্দ সঙ্গীর চেয়ে একাকিত্ব অধিক উত্তম।'

হাদিস শরিফেও বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু যর (রাঃ) বলেন,

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, একাকী থাকা খারাপ সঙ্গীর চেয়ে উত্তম এবং ভালো সঙ্গী একাকী থাকার চেয়ে উত্তম। ভালো কথা শিক্ষা দেওয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম। আর চুপ থাকা খারাপ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম।[৩৭]

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ সঙ্গীর কু-প্রভাবকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিশক (সুগন্ধি) বিক্রেতা ও কামারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতার নিকট থেকে তুমি শূন্য হাতে ফিরবে না। হয় তুমি (নিজে) আতর খরিদ করবে, আর নাহয় তুমি তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাপর হয় তোমার শরীর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, আর নাহয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।[৩৮]

হতে পারে দ্বীন পালনের আগে আপনার বন্ধুসংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন। এখন দ্বীনে আসার পর যদি তা পঁচিশে নামিয়ে আনতে হয়, তবে তা করতে হবে। কারও দশ জনে নামিয়ে আনতে হয় তাকেও তা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অধিক বন্ধু থাকার চেয়ে সৎ, নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল অল্প দুই-চারজন বন্ধু থাকা অনেক বেশি উত্তম। যারা আমার দ্বীন পালনের পথে বাধা হবে না, আমান ঈমান-আমলের জন্য ক্ষতিকর হবে না। মানুষের স্বভাব হলো সংক্রামক ব্যাধির মতো।

---

[৩৭] আল-মুস্তাদরাক : ৫৪৬৬; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি : ৪৯৯২।

[৩৮] সহিহ বুখারি : ২১০১; সহিহ মুসলিম : ৬৫৮৬।

সুতরাং আপনার বন্ধুদের মাঝে যদি খারাপ স্বভাব থাকে তাহলে তা আপনার মাঝেও সংক্রমিত হবে। জানেন তো, মন্দের প্রভাব বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। এ কারণেই অসৎ সঙ্গ পরিহার করতে হবে।

তিন. নিজের অবস্থার উন্নতি করা

দ্বীনের পথে আসার পরে একটা বিষয়ের ওপর আমরা খুব বেশি গুরুত্ব দেবো। সেটা হচ্ছে নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন। প্রতিদিন যেন দ্বীনের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। আমার ইলম ও আমলে তরক্কি হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ মনে করেন, আমাদের কেউ ২০২০ সালে হেদায়াতের ওপর উঠল। এখন এই ২০২৩ সালে এসেও যেন সে আগের স্টেজেই না থাকে। তার ইলম ও আমলের অবস্থা যেন আগের মতোই না থাকে। এমন না হয় যে, তখনও অশুদ্ধ তেলাওয়াতে নামাজ আদায় করত, আর তিন বছর পরে এসে এখনো তার তেলাওয়াত অশুদ্ধই রয়ে গেল। তখনও সে নামাজ-রোজার জরুরি মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তিন বছর পরেও সেগুলো তার অজানাই থেকে গেল। তাই ইলমি ও আমলি দিক থেকে নিজের সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। যত দিন যাবে উত্তরোত্তর আমাদের ইলম ও আমল দুটোকেই আরও বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। ইলম, আমল দুটোই এখানে জরুরি। শুধু আমল বৃদ্ধি পেল, ইলম বৃদ্ধি পেল না—এটাও যেমন যথেষ্ট না। আবার শুধু ইলম বৃদ্ধি পেল, আমল বৃদ্ধি পেল না—এটাও যথেষ্ট না। আমলবিহীন ইলমকে ফলহীন গাছের সাথে তুলনা করা হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার পর আমল থেকে দূরে থাকবে, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ.

‘কেয়ামতের দিন বান্দার পদযুগল এতটুকুও সরবে না, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কীভাবে তার জীবনকালকে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কী কী কাজে তার দেহকে বিনাশ করেছে।[৩৯]

---

[৩৯] সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৭।

হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেমনভাবে গাধা আটা পিষা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামিরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কি আমাদের ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতেন না? সে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাদের ভালো কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজে করতাম না। আর খারাপ কাজের নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজেই তা করতাম।[৪০]

ইলম অনুযায়ী আমল না করা ইহুদিদের চরিত্র। সুরা ফাতেহায় ইহুদিদেরকে 'আল্লাহর ক্রোধের শিকার' বলা হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত আসমানি কিতাব তাওরাতের জ্ঞান রাখত; কিন্তু নিজেরা তদনুযায়ী আমল করত না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা এতটা ভালোভাবে জানত, যেমনইভাবে তারা নিজেদের সন্তানকে ভালোভাবে চিনত; কিন্তু এরপরও তারা তাঁকে আল্লাহর রাসুল হিসেবে স্বীকার করেনি। যেমনটি সুরা 'আনআম'-এর ২০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

বোঝা গেল শুধু জানা থাকার দ্বারা কোনো ফায়দা নেই; যদি সে অনুযায়ী আমল করা না হয়। আবার জানা না থাকলেও সমস্যা। যেটা আপনি জানেন না, যে সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞানই নেই, বা জানলেও ভুল জানেন; এটাই তো অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা। অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার মাঝে ডুবে থাকাকে তো হেদায়াত বলা যায় না। কমপক্ষে মৌলিক জরুরিয়াতে দ্বীন সম্পর্কে তো জানা থাকা লাগবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ﴾

'বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ে কি সমান হতে পারে? উপদেশ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই গ্রহণ করে।'[৪১]

হাদিস শরিফে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'[৪২]

---

[৪০] সহিহ বুখারি : ৩২৬৭।
[৪১] সুরা যুমার : ৯।
[৪২] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৪।

সুতরাং আমাদের উচিত দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের জরুরি বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। অতঃপর স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী নিজেরা আমল করতে থাকা এবং অন্যকেও আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। এ বিষয়ে হাদিসের নির্দেশনাও এমনই যে, নিজের মাঝে থাকা ইলমকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

'আমার নির্দেশনা পৌঁছে দাও, যদি তা একটি আয়াতও হয়।'[৪৩]

সুতরাং ইলম আমল এই দুইয়ের মাঝে করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। ইলম আমল দুটোকেই পূর্বের চেয়ে আরও বেশি উন্নত করতে হবে। এরপর মুমিনের সিফাতগুলোকে ধীরে ধীরে নিজের মাঝে নিয়ে আসার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। তাকওয়া, ইখলাস, পরহেজগারিতা, দুনিয়াবিমুখতা, তাআল্লুক মাআল্লাহ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন) ইত্যাদি বিষয়গুলোও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইলম ও আমলের সাথে সাথে নিজের তাকওয়া, ইখলাস, পরহেজগারিতাকেও উন্নত করতে হবে। আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতেই হবে। সেই ২০২০ সালে আমার তাকওয়া, ইখলাস যে পর্যায়ে ছিল, তিন বছর যদি সেখানেই থাকে তাহলে আমার দ্বীনদারি উন্নত হলো কোথায়? অনেক কিছু জানলাম, মানলাম; কিন্তু গুনাহ ছাড়তে পারলাম না, দুনিয়ার মোহ থেকে বের হতে পারলাম না, হারাম উপার্জন থেকে বের হয়ে আসতে পারলাম না, তাহলে আমি হেদায়াতের পথে অগ্রসর হলাম কীভাবে? মোটকথা, নিজের সার্বিক অবস্থাকে উন্নত করতে হবে। এ সবকিছুকে উপেক্ষা করে কি হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকা আদৌ সম্ভব?

দেখুন, আমাদের চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত এমন রূপ ধারণ করছে, যেখানে হেদায়াতের ওপর থাকা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবী যত সামনে অগ্রসর হচ্ছে, দ্বীন থেকে ছিটকে পড়া ততই সহজতর হচ্ছে। চারপাশে ঈমান হরণের নানা উপায়-উপকরণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকে মুমিনদের জন্য নিজের ঈমানকে টিকিয়ে রাখাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমরা যদি আমাদের ইলম, আমল, তাকওয়া, পরহেজগারিকে প্রতিনিয়ত আরও বেশি উন্নত করতে না পারি, তাহলে এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কীভাবে করব? নিজেই তো দ্বীনের ওপর থাকা

---

[৪৩] সহিহ বুখারি : ৩৪৬১।

মুশকিল হয়ে যাবে। আর নিজের পরিবার-পরিজন ও অপরাপর মুসলমানদের ঈমান-আমল হেফাজতের জন্য কিছু করার বিষয় রয়েই গেল। এ জন্যই বলছি যে, প্রথমে নিজেকে অনেক বেশি উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে নিজে হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার পাশাপাশি অন্যদেরও দ্বীনের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারব।

বাস্তবতা হলো, আমরা অনেক দুর্বল। আর চারপাশের ফেতনা অনেক বেশি শক্তিশালী। আল্লাহ তাআলাও বলেছেন যে, তিনি আমাদের দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের নফসকেই আমরা মোকাবিলা করতে পারি না। নফসের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾

'বস্তুত মন সর্বদা মন্দ কাজেরই আদেশ করে।'[৪৪]

আর মানুষের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

'এবং মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৪৫]

ভেতর থেকে নফসের তাড়না, চারপাশে নিত্যনতুন ফেতনার মহড়া, তার ওপর শয়তানে কুমন্ত্রণা—এই সবকিছুর মোকাবিলা করেই আমাদের দ্বীনের পথে চলতে হবে। হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে হবে। আমরা বসে থাকলেও বসে নেই শয়তান, বিশ্রাম নেই আমাদের প্রবৃত্তির, থেমে নেই ফেতনার অগ্রগতি। এ থেকেই বুঝে নেওয়া দরকার যে, আমাদের কী পরিমাণ সচেতনতা প্রয়োজন, কত বেশি ঈমানি শক্তি অর্জন করা দরকার, ইলম-আমলকে কত বেশি মজবুত করা দরকার। সেই আগের অবস্থায় বহাল থাকার সামান্যতম সুযোগও কি আছে? কিন্তু এই বিষয়টাতেই আজকে আমরা অনেক বেশি উদাসীন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন আমরা নিজেদের হেদায়াতের গ্যারান্টি পেয়ে গেছি। সুতরাং আসুন, এখনই সচেতন হই। নিজের হালতকে উন্নত করার ফিকির করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। যাবতীয় ফেতনা থেকে হেফাজত করেন। আমিন।

---

[৪৪] সুরা ইউসুফ : ৫৩।
[৪৫] সুরা নিসা : ২৮।

মূলকথা

এতক্ষণ আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম এগুলো যদি ভালোভাবে মেনে চলা যায়, তাহলে আশা করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীনের পথে অবিচল থাকাকে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেবেন। যদিও আমরা এখানে তিনটি বিষয়ের ওপর কথা বলেছি, তবে এই বিষয়গুলোর অধীনে আরও অনেক বিষয় চলে আসবে। আমরা শুধু মূল পয়েন্টের ওপর কিছু কথা বললাম। এগুলোর ওপর আরও চিন্তা করা যেতে পারে।

বিশেষ করে ৩ নং পয়েন্টে যেটা বলা হলো যে, আমাদের ইলম-আমল, তাকওয়া, পরহেজগারি ইত্যাদি সার্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। বিশেষ করে দ্বীনি চেতনাবোধকে শক্তিশালী করা এবং দ্বীনকে আরও ভালোভাবে জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। কথা হচ্ছে, এই উন্নয়নের পদ্ধতি কী হবে? এটা অনেক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কেননা, সবার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আবার একই পদ্ধতি সবার জন্য সমান ফলপ্রসূও হবে না। তাই কমপক্ষে শ্রেণিভেদে এটা নিয়ে আরও বেশি চিন্তা করা যেতে পারে যে, কোন শ্রেণির লোকদের জন্য কোন পদ্ধতি অধিক উপযোগী হবে। তবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্য কিন্তু অনেক বেশি গবেষণার দরকার হবে না। প্রত্যেকে আমরা নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারি যে, পাঁচ বছর আগে আমার দ্বীনি অবস্থা কেমন ছিল, আর পাঁচ বছর পর আমি কতটুকু ইম্প্রুভ করতে পেরেছি, দ্বীন সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে কতটুকু সমৃদ্ধ করতে পেরেছি, আল্লাহ তাআলার সাথে আমার সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে নাকি অবনতি, আমি আগের তুলনায় গুনাহ থেকে বেশি বেঁচে থাকতে পারছি, নাকি আমার গুনাহ আরও বেড়ে গেছে, হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার জন্য দৈনন্দিন আমি কতবার আল্লাহর কাছে দু-হাত তুলে দুআ করি। এভাবে প্রতিটি বিষয়ে নিজের ওপর একটা মুহাসাবা আমাদের সবারই করা উচিত।

এভাবে কয়েক মাস পরপর হলেও নিজের হিসাব নিই। মুহাসাবা তো আসলে প্রতিদিন করার বিষয়। কিন্তু প্রতিদিন যদি কেউ করতে সক্ষম না হই, কমপক্ষে ৩ মাস বা ৫ মাস বা ৬ মাসে হলেও নিজের ওপর একটা জরিপ চালাতে পারি যে, আমার আজকের অবস্থান আর ছয় মাস আগের অবস্থানে কি কোনো উন্নতি সাধিত হয়েছে, নাকি আমি আগের অবস্থানেই রয়ে গেছি, (আল্লাহ না করুন) নাকি আমার অবস্থার অবনতি ঘটেছে। যদি দেখি যে, আমি আগের অবস্থানেই আছি বা তার চেয়ে নিচে নেমে গেছি, তখন অতি দ্রুত কীভাবে নিজের অবস্থাকে আরও উন্নত করা যায়, সেই ফিকির করতে হবে। আলেম-

উলামা ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় কোনো প্রবীণ ও বিজ্ঞ আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের কাছে নিজের হালত ব্যক্ত করে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারলে।

আমি মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলার চেষ্টা করেছি :

ক. হেদায়াতের ওপর অবিচলতার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা। হেদায়াতকে লাইফটাইম গ্যারান্টি মনে না করা। বরং যেকোনো সময় যে কারও পদস্খলন ঘটতে পারে—এটা মাথায় রাখা। আর এ কারণেই বেশি বেশি এই দুআ করা,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দান করেছ, তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই মহাদাতা।'[৪৬]

খ. আমরা যেই পরিবেশে আছি, যাদের সঙ্গে চলছি, যাদের সাথে দৈনন্দিন উঠাবসা হচ্ছে, বর্তমানে যে ফ্রেন্ড সার্কেলের মাঝে আছি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করা। অতঃপর নিজের দ্বীন ও হেদায়াতের কথা চিন্তা করে এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা। কাউকে দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর মনে হলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা। যাদের কাছে গেলে, যাদের কাছে বসলে, যাদের সাথে চললে আমরা আরও উৎসাহিত হই, দ্বীনের পথে চলার জন্যে আরও অনুপ্রাণিত হই, যাদের সান্নিধ্যে দ্বীনি চেতনাবোধ বৃদ্ধি পায়, এমন লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা। তাদের কাছে বেশি বেশি যাওয়া। তাদের সঙ্গেই চলাফেরা করার চেষ্টা করা।

গ. যুগের ফেতনার দিকে লক্ষ করে নিজের ইলম-আমল ও তাকওয়া-পরহেজগারিতাকে আপডেট করতে থাকা। নিজের দ্বীনি অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করা। প্রতিনিয়ত নিজের ইলম ও আমলি অবস্থার ওপর মুহাসাবা করতে থাকা। যেকোনো ঘাটতি দেখা দিলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে সামনে অগ্রসর হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

وما توفيقي الا بالله العلي العظيم

---

[৪৬] সুরা আলে ইমরান : ৮

তৃতীয় পর্ব

কারও হেদায়াতের নিশ্চয়তা নেই

আম্মারুল হক

কারও হেদায়াতের নিশ্চয়তা নেই

আমরা কেউই আসলে হেদায়াত পাওয়ার পর হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে পারব কি-না—এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া কেউ জানেন না। আমরা যে হেদায়াত পেয়েছি, দ্বীনের ওপর চলার চেষ্টা করছি, এটা আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এই নেয়ামতের ওপর থাকতে পারব—এর লাইফটাইম কোনো শিওরিটি নেই। কারণ, আমরা কেউই ফেরেশতা না। আমরা রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। আমাদের মাঝে রয়েছে নফস বা প্রবৃত্তি। এই নফস আমাদেরকে গুনাহের দিকে প্ররোচিত করে। আমাদের পেছনে রয়েছে শয়তান ও তার দোসররা। মানুষ ও জিন শয়তান আমাদের গুনাহের কুমন্ত্রণা দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾

> ‘যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।’[৪৭]

এই শয়তান আমাদের চিরশত্রু। আমাদেরকে হেদায়াত থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তার মেহনত সদা চলমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا﴾

> ‘এবং এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য কোনো না কোনো শত্রুর জন্ম দিয়েছি (অর্থাৎ মানব ও জিনদের মধ্য হত শয়তান কিসিমের লোকদেরকে); যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে বড় চমৎকার কথা শেখাত।’[৪৮]

এভাবে জিন ও মানব শয়তানগুলো পরস্পর সম্মিলিতভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় নিয়োজিত। নবীরা পর্যন্ত তাদের শত্রুতা থেকে রেহাই পাননি। হেদায়াত থেকে বিচ্যুত হওয়ার এত এত আয়োজনের মধ্য থেকে নিজের

---

[৪৭] সুরা নাস : ৫-৬।
[৪৮] সুরা আনআম : ১১২।

হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এ কথাও জানিয়েছেন যে,

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

> 'আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং সে জন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।'[৪৯]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে এই ওয়াদাও দিয়ে রেখেছেন যে, ঈমানের সাথে সে যদি পরকালের সফলতা অর্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সেই চেষ্টার মর্যাদা দেবেন। সুতরাং যদিও চারদিকে রাহাজানির ভয়, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, আমরা যদি ঠিকভাবে মেহনত করি তাহলে তিনি আমাদের ব্যর্থ করবেন না। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে হেদায়াতকে ভালোভাবে বুঝে নিয়ে এর ওপর অবিচল থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। উদাসীনতা নয়, প্রয়োজন সচেতন প্রচেষ্টার।

হেদায়াতের পরিচয়

হেদায়াত কী জিনিস? হেদায়াত হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম। হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার মারেফত, আল্লাহপ্রদত্ত নুর—যে নুরে আলোকিত হয় বান্দার অন্তর, তখন বান্দা বুঝতে পারে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে যে প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো বুঝতে পারা—এই বুঝই হচ্ছে হেদায়াত। যার এই বুঝ অর্জিত হবে সে আল্লাহকে মানতে পারবে। যে এই বুঝ থেকে বঞ্চিত, সে আল্লাহর আনুগত্য থেকেও দূরে থাকবে।

মৌলিকভাবে হেদায়াতকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. الهداية العامة (ব্যাপক হেদায়াত)

যে হেদায়াত ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের জন্য। সকল সৃষ্টি জুড়েই যার পরিব্যাপ্তি। এই হেদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেছেন। সকল সৃষ্টিকে স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানিয়েছেন। এই প্রকারের

---

[৪৯] সুরা বনি ইসরাইল : ১৯।

হেদায়াতের জন্য কোনো নবী-রাসুল ও আসমানি কিতাবের প্রয়োজন নেই। বরং সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান নিদর্শনাবলিই আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই হেদায়াতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে। প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এই হেদায়াত শুধু মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা, তরুলতা পুরো সৃষ্টিজগৎ জুড়ে তা বিস্তৃত।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ﴾

> ‘সাত আসমান ও জমিন এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সৃষ্টি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, এমন কোনো জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবিহ বুঝতে পারো না।’[৫০]

খ. هداية الإرشاد و الدلالة (হক-বাতিলের পথনির্দেশ)

এই হেদায়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-খারাপ ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারার যোগ্যতা দান করেন। মানুষ যখন এ হেদায়াতের আলোতে আলোকিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে তাকে কোন পথে চলতে হবে। তার সামনে হক ও বাতিল স্পষ্ট হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে কোনটা সিরাতে মুস্তাকিমের পথ, আর কোনটা গোমরাহির পথ। কোন পথে নাজাত, আর কোন পথে ধ্বংস। এটাই হচ্ছে ‘হেদায়াতুদ দালালাহ ওয়াল ইরশাদ’; অর্থাৎ ভালো-মন্দ ও হক-বাতিলের পথনির্দেশ। মূলত এই হেদায়াত প্রথম প্রকারের সাধারণ হেদায়াতেরই একটা অংশ। তবে তা প্রথম প্রকারের ন্যায় সামগ্রিকতাকে ধারণ করে না।

আল্লাহ তাআলা নিজ অস্তিত্বকে বোঝানোর জন্য সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন উপাদান রেখেছেন। তিনি খুঁটিহীন বিশাল আকাশ সৃষ্টি করেছেন, জমিনকে করেছেন সমতল, জমিনের বুক চিরে প্রবাহিত করেছেন সুবিশাল সাগর ও অসংখ্য নদনদী, আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বৃষ্টি, জমিন থেকে উৎপন্ন করেন ফসল,

---

[৫০] সুরা বনি ইসরাইল : ৪৪।

তিনি এই সমতল ভূমির ওপর স্থাপন করেছেন সুবিশাল পাহাড়সমূহ, সৃষ্টি করেছেন গ্রহ-উপগ্রহ, অগনতি নক্ষত্ররাজি, তিনিই গড়েছেন গোটা সৌরজগৎ, পরিচালনা করছেন সমগ্র জাহান। এই সবকিছুর মাঝে বান্দার জন্য রয়েছে নিদর্শন, স্রষ্টার অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার নিদর্শন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ﴾

‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে, রাত-দিনের একটানা আবর্তনে, সেইসব নৌযানে—যা মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে বয়ে চলে, সেই পানিতে—যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে ও সেই মেঘমালাতে—যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আজ্ঞাবহ হয়ে সেবায় নিয়োজিত আছে—বহু নিদর্শন আছে সেসব লোকের জন্য, যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।’[৫১]

এভাবে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে স্রষ্টার নিদর্শন, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে, পেতে পারে নিজ রবের পরিচয়। সকল মানুষের জন্যই তা উন্মুক্ত। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগালে যে কেউ এই হেদায়াত পেতে পারে। এ জন্য এটা ছিল ‘হেদায়াতে আম্মাহ’ অর্থাৎ সকলের জন্য ব্যাপক হেদায়াত।

কিন্তু এখানে আমরা ‘হেদায়াতুদ দালালাহ ওয়াল ইরশাদ’ বলতে যেই হেদায়াতকে বোঝাচ্ছি, তা প্রথম প্রকারের মতো নয়। এই হেদায়াতের জন্যই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন। এই হেদায়াতের জন্যই আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিল করেছেন। নবীগণ দুনিয়াতে এসে মানুষের মাঝে এই হেদায়াতের জন্যই মেহনত করেছেন। মানুষের সামনে ভালো-মন্দের পার্থক্যকে স্পষ্ট করেছেন, সত্য ও ভ্রষ্টতার পথ সম্পর্কে মানুষকে জানিয়েছেন, মানুষকে দেখিয়েছেন সফলতার রাজপথ, কীসে আল্লাহর সন্তুষ্টি কীসে তাঁর অসন্তুষ্টি—সে সম্পর্কে অবগত করেছেন। এভাবে সকল মানুষকে

---

[৫১] সুরা বাকারা : ১৬৪।

নবীগণ গোমরাহি থেকে ফিরিয়ে হকের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে হক-বাতিলের পথনির্দেশনার হেদায়াত। আসমানি কিতাব ও নবী-রাসুলদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে হেদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন।

গ. هداية التوفيق و الإلهام (হক গ্রহণের আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিক)

দ্বিতীয় প্রকার হেদায়াতের মাঝে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমানি কিতাব ও নবী-রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে বান্দার সামনে হক-বাতিলকে স্পষ্ট করেছেন। যদিও হকের পথে নবীদের দাওয়াত সকলের জন্য ব্যাপক (عام) ছিল, কিন্তু সকল মানুষই নবীদের সেই দাওয়াত গ্রহণ করেনি। সবার পক্ষেই বাতিলকে বর্জন করে হকের পথে চলা সম্ভব হয়নি। কেবল সেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সত্যকে গ্রহণ করতে পেরেছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিয়েছেন। তারাই ভ্রষ্টতা বের হয়ে আসতে পেরেছে, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আলোর পথে বের করে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ﴾

> ‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।’[৫২]

বোঝা গেল, গোমরাহি ছেড়ে আলোর পথে আসার আহ্বান সকলের জন্য ব্যাপক হলেও সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার তাওফিক সবার জন্য ব্যাপক নয়। এই তাওফিক কেবল সে-ই লাভ করে, যার অন্তরে হেদায়াত লাভের প্রত্যাশা থাকে, সত্যিকার অর্থেই যে হকের ওপর চলতে চায়, যার মাঝে সত্যকে কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। এই হেদায়াত কেবল সে-ই পায়, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যাকে তা দান করেন। এ জন্যই এটাকে বলা হচ্ছে ‘হেদায়াতুত তাওফিক ওয়াল ইলহাম’ অর্থাৎ, হক গ্রহণের আল্লাহপ্রদত্ত তাওফিক ও সত্যের প্রতি ঐশী প্রেরণা। এই হেদায়াতের বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ তাআলার হাতে। নবীদেরও দায়িত্ব ছিল শুধু মানুষকে সত্যের পথে দাওয়াত দেওয়া, কিন্তু কাউকে সত্য গ্রহণ করানোর ক্ষমতা নবীদেরও নেই। কারও অন্তরে সত্যকে ঢুকিয়ে দেওয়ার শক্তি কারও নেই। এটা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা

---

[৫২] সুরা বাকারা : ২৫৭।

হাতে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

‘(হে রাসুল!) সত্যি কথা হলো, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা করবে তাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন। কারা হেদায়াত কবুল করবে তা তিনিই ভালো জানেন।’[৫৩]

এই প্রকারের হেদায়াতের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

‘কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।’[৫৪]

মূলত এই হেদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হেদায়াত। কেননা শুধু হক-বাতিলের পরিচয় জানা কোনো সফলতা বয়ে আনবে না। বরং বাতিলকে বর্জন করে সত্যকে গ্রহণ করার মাঝেই সফলতা। তাই আল্লাহপ্রদত্ত এই হেদায়াত যে লাভ করল, সে-ই প্রকৃত হেদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

‘আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত, আর আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।’[৫৫]

এটাই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলতে পারার হেদায়াত। সুরা ফাতেহাতে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই হেদায়াতের প্রার্থনাই শিখিয়েছেন। প্রতি নামাজে এই হেদায়াত চেয়েই আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি,

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

‘আমাদের সরল পথে পরিচালিত করো।’[৫৬]

---

[৫৩] সুরা কাসাস : ৫৬।
[৫৪] সুরা নাহল : ৯৩।
[৫৫] সুরা আরাফ : ১৭৮।

অর্থাৎ, আমাদের পরিচালিত করুন সত্য ও ন্যায়ের পথে। বিভ্রান্তি ও গোমরাহির পথে আমাদের পরিচালিত করবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 'হেদায়াতুত তাওফিক ওয়াল ইলহাম' দান করেন।

ঘ. غاية الهداية (চূড়ান্ত হেদায়াত)

'গায়াতুল হেদায়াহ' মানে হেদায়াতের চূড়ান্ত গন্তব্য। যে হেদায়াত বান্দাকে চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছে দেয়, যেখানে পৌঁছে হেদায়াত পূর্ণ হয়, সেটাকেই আমরা 'গায়াতুল হেদায়াহ' বা চূড়ান্ত হেদায়াত বলছি। এটা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভের হেদায়াত। এটাই চূড়ান্ত হেদায়াত। এখানে এসেই হেদায়াতের পূর্ণতা। অর্থাৎ একজন মানুষ জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে দাখিল হয়ে গেল, মানে তার হেদায়াত পূর্ণতায় পৌঁছল। আল্লাহ তাআলা তাকে চূড়ান্ত হেদায়াত পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

> 'অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে।'[৫৭]

বোঝা গেল হেদায়াতের চূড়ান্ত সীমা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ও জান্নাত প্রাপ্তি।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রাথমিকভাবে দুনিয়ার সবাইকে আল্লাহ তাআলা একধরনের হেদায়াত দিয়েছেন। কাফের-মুশরিকসহ সকলেই এই হেদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। সকলের নিকট আল্লাহ তাআলা নিজ পরিচয়কে স্পষ্ট করেছেন। স্বীয় অস্তিত্বের জানান দিয়েছেন। কেউ-ই এর বাইরে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾

'তারা (অর্থাৎ কাফেররা) কি কোনো পথ-নির্দেশ লাভ করেনি এ বিষয় দ্বারা যে, তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমি দিয়ে তারা চলাফেরা করে থাকে? নিশ্চয়ই

৫৬] সুরা ফাতেহা : ৬।
৫৭] সুরা আলে-ইমরান : ১৮৫।

এর মধ্যে তাদের জন্য আছে বহু নিদর্শন। তবে কি তারা শোনে না?'[৫৮]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কাফেরদের নিকটও হেদায়াতকে স্পষ্ট করেছেন। এই দিক থেকে সকলের নিকটই হেদায়াত পৌঁছেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা নবী-রাসুল ও কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে মানুষের নিকট হক-বাতিল, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং অন্ধকার ও আলোর পথকে স্পষ্ট করেন। অতঃপর বিশেষভাবে নিজ মর্জিমাফিক তাঁর সৌভাগ্যশীল বান্দাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসেন। সব শেষে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের তিনি চূড়ান্ত গন্তব্য তথা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এই হলো হেদায়াতের চারটি ধাপ।

ইমাম কুরতুবি রহ. হেদায়াতকে দুই প্রকারে ভাগ করেছেন। একটা হচ্ছে الهداية العامة বা সর্বজনীন ব্যাপক হেদায়াত। যেটা আমরা ওপরে প্রথম প্রকারে আলোচনা করেছি। আরেকটা হচ্ছে الدلالة هداية বা হক-বাতিলের পথনির্দেশ। যে হেদায়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্য সকল নবীর মাধ্যমে মানুষকে নিজের দিকে ডেকে নিয়েছেন। গোমরাহির অন্ধকার থেকে বের করে সত্যের আলোয় আলোকিত করেছেন। বান্দাকে ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর আনুগত্যের তাওফিক দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

'এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে পথপ্রদর্শক।'[৫৯]

অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতির জন্যই হেদায়াতের পথ দেখানোর কেউ না কেউ ছিল। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সেই জাতির লোকদের হেদায়াতের ওপর এনেছেন। নিজের আনুগত্য করার তাওফিক দিয়েছেন। এই হেদায়াত কেবল আল্লাহর হাতে। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে কালিমা পড়ানোর চেষ্টা করছিলেন এবং তাকে ঈমান আনানোর জন্য অস্থির ছিলেন, খুব করে চাচ্ছিলেন যে আবু তালিব আল্লাহর ওপর ঈমান আনুক, তখন সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করেন,

---

৫৮] সুরা সাজদাহ : ২৬।
৫৯] সুরা রাদ : ৭।

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

'(হে রাসুল!) সত্যি কথা হলো, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা করবে তাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করতে পারবে না; বরং আল্লাহ যাকে চান হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন। কারা হেদায়াত কবুল করবে তা তিনিই ভালো জানেন।'[৬০]

এই হেদায়াত হচ্ছে বান্দাকে জান্নাতের পথে নিয়ে আসার হেদায়াত। এ পথে চললেই বান্দা হেদায়াতের চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জান্নাতের রাস্তা দেখান। অতঃপর তাকে সে পথে পরিচালিত করে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেন, এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হেদায়াত দান। মূলত ইমাম কুরতুবি রহ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হেদায়াতের আলোচনাকে একই শিরোনামের অধীনে নিয়ে এসেছেন।

আল্লাহ তাআলা কাকে হেদায়াত দেন

এখন কথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা এই হেদায়াত কাকে দেন? আল্লাহ তাআলার নিকট যদি কেউ হেদায়াত না চায়, তার অন্তর যদি হেদায়াতের প্রত্যাশী না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত দেবেন না। কেননা হেদায়াত লাভের জন্য হেদায়াত চাইতে হয়, আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করতে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআন মাজিদে হেদায়াতপ্রাপ্তির মাধ্যমগুলো আমাদেরকে শিখিয়েছেন। মানুষ কীভাবে হেদায়াত পাবে, তা বুঝিয়ে বলেছেন। আসবাবে হেদায়াত বা হেদায়াত পাওয়ার মাধ্যমগুলো বর্ণনা করেছেন।

প্রথম কথা তো বললাম, বান্দার মাঝে হেদায়াত লাভের কামনা থাকতে হবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বান্দাকে হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা করা শিখিয়েছেন। হেদায়াত লাভের আরেকটা বড় মাধ্যম হচ্ছে سعة الصدر তথা 'অন্তরের প্রশস্ততা'। অর্থাৎ অন্তরে হেদায়াত প্রবেশের জন্য বান্দার অন্তরকে প্রসারিত করতে হবে। বুকের মধ্যে হেদায়াত ধারণ করার মতো জায়গা তৈরি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

---

৬০] সুরা কাসাস : ৫৬।

﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾

‘আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে।’[৬১]

অর্থাৎ, ইসলামের পথে আসার হেদায়াতের জন্য বান্দার বক্ষটা উন্মুক্ত থাকতে হয়। উন্মুক্ত অন্তরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর আসে।

এরপরই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

‘সুতরাং ধ্বংস সেই কঠোরপ্রাণদের জন্য, যারা আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ। তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।’[৬২]

অর্থাৎ, কঠিন ও সংকুচিত অন্তরে হেদায়াতের নুর প্রবেশ করে না। ফলে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তারা গোমরাহি ও বিভ্রান্তিতে ডুবে থাকে। সুতরাং হেদায়াত লাভের জন্য অন্তরটাকে বড় করতে হবে, প্রসারিত রাখতে হবে। কোনো ধরনের সংকীর্ণতা যেন আমাদের অন্তরকে অবরুদ্ধ করে দিতে না পারে।

হেদায়াত প্রাপ্তির পর গোমরাহি

হেদায়াতপ্রাপ্তির পর পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যাওয়া মৌলিকভাবে দুই ধরনের :

এক. ঈমান ও ইসলাম থেকেই বেরিয়ে যাওয়া। এমন ব্যক্তি পুরোপুরি দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়। দ্বীন ইসলামে তার আর কোনো অংশ থাকে না। সে মুমিন ছিল, পরে কাফের ও মুশরিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, সে মুসলমান ছিল, এখন সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ত্যাগ করেছে। তাকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলা হয়। তার ব্যাপারটা আলাদা। তাকে পুনরায় কালেমা পড়ে ঈমান নবায়ন করতে হবে। তখনই সে পুনরায় হেদায়াতে ফিরতে পারবে। পূর্ণ

১] সুরা যুমার : ২২।
২] সুরা যুমার : ২২।

তাওবা ও ঈমান নবায়ন করা ছাড়া সে গোমরাহি থেকে বের হতে পারবে না।

দুই. দ্বীন পালন না করা, দ্বীন মানার ব্যাপারে উদাসীন থাকা। দ্বীনের সঠিক বুঝ পাওয়ার পর সবকিছু জেনে-বুঝে আবার গাফেল হয়ে যাওয়া। হয়তো-বা একটা সময় সে দ্বীনের ওপর চলত, দ্বীন মানার চেষ্টা করত, নিয়মিতভাবে নামাজ-রোজা পালন করত, হারাম থেকে বেঁচে থাকত, হালাল অবলম্বন করত, মাহরাম-ননমাহরাম মেনে চলত। কিন্তু এখন সে কিছুই করে না। দ্বীনের কোনো বিধিনিষেধ পালন করে না, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, ফরজ বিধানগুলোর ব্যাপারেও উদাসীন। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আল্লাহর রাসুলের প্রতি ঈমান রাখে, পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, আল্লাহর কিতাবের ওপর ঈমান রাখে, পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে, মোটকথা জরুরিয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে তার ঈমান ও আকিদা ঠিক আছে। অর্থাৎ, তার সমস্যা শুধু আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এমন ব্যক্তি পুরোপুরি দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। সে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী নয়। তখনও সে মুসলমান থাকবে। এই ব্যক্তি নিজেও নিজের মুসলমানিত্বকে অস্বীকার করে না। সে নিজেকে আল্লাহ তাআলার বান্দা ও ইসলাম ধর্মের অনুসারী—মুসলমান হিসেবেই পরিচয় দেয়। কিন্তু সে উদাসীনতার গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নফসের তাড়না ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমল থেকে দূরে সরে গেছে, বিভিন্ন গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এমন ব্যক্তিকে পুনরায় নিজের ঈমানকে নবায়ন করতে হবে না। কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করার মাধ্যমে এবং পুনরায় দ্বীনের বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলার দ্বারাই সে নতুন করে হেদায়াতে ফিরে আসতে পারে। মূলত এই ফেরাকেই আমরা 'দ্বীনে ফেরা' বলছি। অর্থাৎ, দ্বীন পালনের ব্যাপারে সে যে উদাসীনতার মাঝে নিমজ্জিত ছিল, সেই উদাসীনতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে পুনরায় পালনে সচেষ্ট হয়েছে।

এই দ্বিতীয় প্রকারের দ্বীনে ফেরা বা দ্বীন থেকে হারিয়ে যাওয়ার এই দ্বিতীয় প্রকারই মূলত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়।

প্রথম প্রকার গোমরাহি থেকে বের হওয়ার জন্য তো ঈমান নবায়ন করতে হবে। সেটার সম্পর্ক ঈমান-আকিদার সাথে। আর দ্বিতীয় প্রকার গোমরাহির রোগ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যথাযথ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগ হতে

আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। এখানে আমি কিছু বিষয় তুলে ধরব। আশা করি এগুলো পালন করার দ্বারা হেদায়াতের ওপর টিকে থাকা সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ।

কলব বা অন্তর পরিষ্কার রাখা

কলব স্বচ্ছ থাকলে তাতে ভ্রষ্টতার অন্ধকার বাসা বাঁধতে পারে না। কলবকে পরিষ্কার করার উপায় হলো বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। কুরআন তেলাওয়াত করা। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, নিশ্চয়ই অন্তরে মরিচা ধরে, যেভাবে পানি লাগলে লোহায় মরিচা ধরে। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই মরিচা দূর করার উপায় কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন,

كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ.

'বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা।'[৬৩]

আল্লাহর জিকিরকে আবশ্যক করে নেওয়া

আল্লাহ তাআলার জিকিরের দ্বারা অন্তর সজাগ থাকে, অন্তরে প্রশান্তি আসে। প্রশান্ত, জাগ্রত অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। ফলে হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকা সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলার জিকির মানে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে অন্তরের মধ্যে হাজির-নাজির রাখা। আল্লাহ তাআলা আমার সবকিছু দেখছেন, আল্লাহ তাআলা আমার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, আমার প্রতি মুহূর্তের অবস্থান ও নড়াচড়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন—এই চিন্তা অন্তরে জাগ্রত থাকলে গোনাহ করাই সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

[৬৩] শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি : ১৮৫৯।

﴿وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ﴾

'আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানেন।'[৬৪]

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

﴿اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

'জেনে রাখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।'[৬৫]

অন্তরে আল্লাহর স্মরণ মানুষকে গাফলত থেকে মুক্তি দেয়। আর বান্দা যতক্ষণ গাফেল না হয়, সে হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

কুরআন তেলাওয়াত করা

কুরআন আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করার দ্বারা অন্তরে নুর সৃষ্টি হয়। কুরআনে তাদাব্বুর করার দ্বারা চিন্তার জগতে হেদায়াতের দ্বার উন্মোচিত হয়। কালামুল্লাহ শরিফ অন্তরকে নরম করে, হেদায়াত কবুলের জন্য প্রস্তুত করে। পক্ষান্তরে কুরআন তেলাওয়াত থেকে দূরে সরার কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল, তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা হলে তাদের অন্তর বিগলিত হতো, চোখে অশ্রু প্রবাহিত হতো। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা মুমিনের সিফাত সম্পর্কে বলেন,

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا﴾

> 'মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।'[৬৬]

কুরআনের একটা বরকত হচ্ছে কারও সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা হলে সে যত বড় নাফরমান বান্দাই হোক না কেন, তার অন্তরে কুরআন রেখাপাত

---

[৬৪] সুরা মুহাম্মাদ : ১৯।
[৬৫] সুরা রাদ : ২৮।
[৬৬] সুরা আনফাল : ২।

করে। কুরআনের কিছু না কিছু প্রভাব তার অন্তরে প্রতিফলিত হয়। ফলে যত বড় কঠিন প্রাণই হোক না কেন, সে সরাসরি কুরআনকে উপেক্ষা করার হিম্মত করে না। হযরত উমর (রাঃ)-এর মতো বজ্রকঠিন ব্যক্তির অন্তর পর্যন্ত শুধুমাত্র কুরআনের তেলাওয়াতের প্রভাবে বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি ইসলাম কবুল করে হেদায়াতের আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন। এটাই কুরআনের প্রভাব, কুরআনের বরকত। এ জন্য দৈনন্দিন কিছু পরিমাণ হলেও কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে পারলে ইনশাআল্লাহ এর বরকতে হেদায়াতের ওপর থাকা সহজ হয়ে যাবে। তেলাওয়াতের পাশাপাশি একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কুরআন মুখস্থ থাকাও জরুরি। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ﴾

'যার অভ্যন্তরে কুরআনের কিছু অংশও নেই, সে বিরান ঘরের মতো।'[৬৭]

কুরআন হচ্ছে মুমিনের জন্য পথপ্রদর্শক। কুরআন হেদায়াত লাভের মাধ্যম। এই কুরআন দ্বারা আল্লাহ কাউকে হেদায়াতে আনেন, আবার কুরআন দ্বারাই কাউকে হেদায়াত থেকে বের করে দেন। কুরআন হৃদয়ের প্রশান্তি, অন্ধকার কবরের জ্যোতি। তাই কুরআনের সাথে সম্পর্ককে গভীর করতে হবে। নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআনের মর্ম বোঝার চেষ্টা করাও জরুরি। আর কুরআন তাদাব্বুরের নেয়ামত যার নসিব হয়েছে, সত্যি সত্যি সে বড় সৌভাগ্যের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এই নেয়ামত দান করুন।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করার দ্বারা আল্লাহর কুদরতের বিশালতাকে অনুভব করা যায়। এতে ঈমান বৃদ্ধি পায়। বান্দা যখন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবে, তার সামনে নিজের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা ভেসে ওঠে। ফলে সুমহান স্রষ্টার সামনে তার মাথা নুইয়ে আসে। মনের অজান্তেই সে বলে ওঠে, الله اكبر। আল্লাহ মহান, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে

---

[৬৭] সুনানুত তিরমিজি : ২৯১৩।

নানাভাবে তাঁর সৃষ্টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষকে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করার জন্য বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾

'তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কীভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে? এবং ভূমির প্রতি, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে?'[৬৮]

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সৃষ্টির কথা বলে বলে মানুষকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾

'বলো তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেছেন পানি; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি?'[৬৯]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা কীভাবে ধরে ধরে মানুষকে বুঝিয়েছেন। এ জন্য সৃষ্টির চিন্তা থেকে স্রষ্টাকে জানা এটা কুরআনি ফর্মুলা। এই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ হেদায়াত লাভের মাধ্যম। তাই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে। এতে আমাদের হেদায়াত সুদৃঢ় হবে।

---

[৬৮] সুরা গাশিয়াহ : ১৭-২০।

[৬৯] সুরা নামল : ৬০।

বেশি বেশি দুআ করা

দুআ মুমিনের হাদিয়ার। সুতরাং দুআর মাধ্যমে সে তার হেদায়াতকে সুরক্ষিত রাখতে পারো যে বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকট হেদায়াত চায়, তাঁর নিকট হেদায়াত প্রার্থনা করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বান্দাকে হেদায়াতের দৌলত দান করেন। এক হাদিসে কুদসিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ﴾

> 'হে আমার বান্দারা। তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট। তবে আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দেবো।'[৭০]

পবিত্র কুরআন মাজিদেও আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার দুআ শিক্ষা দিয়েছেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

> 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যখন হেদায়াত দান করেছ তারপর আর আমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি করো না এবং একান্তভাবে নিজের পক্ষ হতে আমাদেরকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই মহাদাতা।'[৭১]

সুতরাং হেদায়াত লাভের জন্য এবং হেদায়াত পাওয়ার পর তার ওপর অবিচলতার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে বেশি বেশি দুআ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার নিকট যদি একবার নিজের হেদায়াতকে কবুল করিয়র নেওয়া যায়, তাহলে ভয় নেই। তখন বান্দার হেদায়াতকে সুরক্ষিত রাখার যাবতীয় বন্দোবস্ত আল্লাহ নিজেই করে দেবেন এবং তাকে হেদায়াতের ওপর অবিচল রাখবেন।

---

[৭০] সহিহ মুসলিম : ৬৪৬৬।
[৭১] সুরা আলে-ইমরান : ৮।

আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াতকে জানা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তিনি শুধু আমাদের সৃষ্টিকর্তাই নন, বরং তিনি আমাদের পালনকর্তা, রিজিকদাতা, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। এভাবে আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াত সম্পর্কে জানা। তাঁর নাম ও সিফাতের জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের খালিক (সৃষ্টিকর্তা), তিনি কীভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ তাআলা রাজ্জাক, তিনি কীভাবে আমাদের রিজিক দেন? আল্লাহ আমাদের রব, তিনি কীভাবে আমাদের প্রতিপালন করেন? তিনি গোটা জাহানের মালিক, সবকিছুর ওপর কীভাবে তাঁর কর্তৃত্ব চলছে? আল্লাহর সিফাতগুলোকে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শুধু জানা থাকা যথেষ্ট নয়, বরং উপলব্ধি করতে হবে। তাবলিগে এক মুরুব্বি খুব সুন্দর বলেছিলেন, 'মালুমাতকে মামুলাতে রূপান্তর করার নামই হচ্ছে ইলম।' 'মালুমাত' মানে অর্জিত জ্ঞান, জানা বিষয়, পুঁথিগত বিদ্যা। আর 'মামুলাত' মানে নিত্য আমল। অর্থাৎ, নিজের অর্জিত জ্ঞান ও জানা বিষয়গুলোকে নিত্য আমলে রূপান্তর করতে হবে। শুধু জানা থাকা দ্বারা বিশেষ উপকার নেই, যদি তার ওপর আমল না করা হয়। এ জন্য আল্লাহ তাআলার আসমা ও সিফাতের জ্ঞানকে অন্তর দ্বারা অনুভব করতে হবে। তাহলে এর দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পাবে। হেদায়াত মজবুত হবে।

হেদায়াত প্রকাশ করা ও শুকরিয়া আদায় করা

আল্লাহ তাআলা আমাদের হেদায়াতের পথে এনেছেন, দ্বীনের বুঝ দান করেছেন—এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। সুতরাং এর জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট শুকরিয়া আদায় করা। শুকরিয়া আদায়ের দ্বারা আল্লাহ বান্দার নেয়ামতকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদেরকে আরও দেবো এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।'[৭২]

---

[৭২] সুরা ইবরাহিম : ৭।

এ জন্য হেদায়াতপ্রাপ্তিকে নেয়ামত মনে করতে হবে এবং অনেক বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। সাথে সাথে নিজের হেদায়াতকে প্রকাশ করতে হবে। বাহ্যিক বেশভূষায়, দৈনন্দিন আমল-ইবাদতে, চলনে-বলনে, আখলাক-চরিত্রে, মুআমালা-মুআশারাতে, সত্যের পক্ষ অবলম্বন ও বাতিলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের হেদায়াতকে প্রকাশ করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, দ্বীনের বুঝা পাওয়ার আগেও আমাদের ঈমান, আমল, আখলাক, লেনদেন, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির যেমন অবস্থা ছিল, দ্বীনের বুঝা পাওয়ার পরেও তেমনই রয়ে গেল। দ্বীনকে বোঝার আগেও যেমন বাতিলের পক্ষে সরব ছিলাম, হকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দ্বীনে আসার পরেও যদি অনুরূপ চিত্রই বহাল থাকে, তাহলে আমাদের হেদায়াত প্রকাশ পেল কোথায়? শুধু মনে মনে ধরে নিলাম আমি হেদায়াতের ওপর আছি, কিন্তু নিজের মাঝে তার প্রকাশ ঘটাতে পারলাম না, অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেকে খুব দ্বীনদার মনে করলাম, অথচ হেদায়াতকে প্রকাশ করার স্থান ও পরিস্থিতিতে হেদায়াতকে প্রকাশ করতে পারলাম না, তাহলে এটা তো হেদায়াতের শুকরিয়া আদায় হলো না। এমন হেদায়াত কতদিন স্থায়ী হবে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তাই হেদায়াতের স্থায়িত্ব ও মজবুতির জন্য শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে নিজের মাঝে হেদায়াতকে উদ্ভাসিত করতে হবে।

বেশি বেশি তাওবা করা

মূলত গুনাহ করার দ্বারা বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। আর বান্দা থেকে তো গুনাহ হয়েই যায়। তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে বান্দা কীভাবে হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকবে? এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে তাওবা। বারবার গুনাহ হতে থাকলে বারবারই তাওবা করতে হবে। আল্লাহর ক্ষমার আশ্রয় নিতে হবে। কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকতে হবে। এর মানে এই নয় যে, আমরা শুধু গুনাহ করতেই থাকব। বরং সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার। কোনোভাবেই আমরা যেন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত না হই। কিন্তু অনেক সচেতনতার পরেও মানুষ হিসেবে আমাদের দ্বারা কিছু গুনাহ হয়ে যেতে পারে এবং কোনো নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট গুনাহের বারংবার পুনরাবৃত্তিও ঘটে যেতে পারে (আল্লাহ হেফাজত করেন); তো এমতাবস্থায় নিরাশ হওয়া যাবে না।

আল্লাহর রহমতের আশা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বরং কৃত অপরাধের জ অনুতপ্ত হয়ে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। সুতর তাওবাকে নিজের জরুরি বানিয়ে নিতে হবে। তাওবা করার দ্বারা আল্লাহ হন। ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ মাফ করেন, গুনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেন, রিজিক দান করেন এবং বিপদ থে মুক্তির পথ করে দেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশ করেন,

مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

‘কোনো ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার পড়লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।’[৭৩]

মুজাহাদা করা

হেদায়াত লাভের পর হেদায়াতকে ধরে রাখার জন্য মুজাহাদা করতে হবে মুজাহাদা হবে স্বীয় নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে। প্রবৃত্তি যা চায় তা করা না। খাহেশাতের স্রোতে ভেসে যাওয়া যাবে না। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ শিখতে হবে। এর দ্বারা ঈমান দৃঢ় হয়। বারবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে এ দুর্বল হতে থাকে। যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার ফয়সালাকে নিতে হবে, নিজেকে দ্বীনের অনুগত রাখতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা না। যে প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে থাকল, সে যেন প্রবৃত্তিকেই তার বানিয়ে নিলো। সুতরাং তার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করে

﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ﴾

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হতে আগত হেদায়াত ছাড়া কেবল নি খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হ

---

[৭৩] সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৮; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮১৯।

পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।'[৭৪]

যারা প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশি অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তারা জালেম। আর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট বলে দিলেন যে, তিনি জালেমকে হেদায়াত দেবেন না। তাহলে প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে মুজাহাদা না করে আমরা কীভাবে হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার আশা করতে পারি? একইভাবে শয়তানের বিরুদ্ধেও মুজাহাদা করতে হবে। শয়তান আমাদের চিরশত্রু। কেউ কি তার শত্রুর অনুসরণ করতে পারে? সুতরাং শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাদের হেদায়াতকে সুরক্ষিত রাখতে হলে এই শত্রুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তিনি যেন আমাদের ঈমান ও হেদায়াতকে শয়তানের খপ্পর থেকে হেফাজত করেন। শয়তানকে কোনো অবস্থাতেই নিজের সঙ্গী বানানো যাবে না। শয়তানের চেয়ে মন্দ সঙ্গী আর হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا﴾

'বস্তুত শয়তান কারও সঙ্গী হয়ে গেলে সঙ্গীরূপে সে বড়ই নিকৃষ্ট।'[৭৫]

তাই আমরা শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করব না। শত্রুর বিরুদ্ধে মুজাহাদা করেই আমাদের হেদায়াতকে সুরক্ষিত রাখব, ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনি মজলিসে যাওয়া

দ্বীনি মজলিসগুলোতে যাওয়ার দ্বারা ঈমান তাজা হয়। দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা যায়। বিভিন্নভাবে উপকৃত হওয়া যায়। আলেম-উলামাদের মজলিসে বসার দ্বারা দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আলেমদের সান্নিধ্যে হতে পারে আমাদের হেদায়াতের জন্য সুরক্ষাপ্রাচীর। আলেমদের সাথে সম্পর্ক থাকলে শয়তান সহজে বিভ্রান্ত করতে পারে না। অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না। তাই দ্বীনি মজলিসে গমন ও আলেমদের সান্নিধ্যকে জরুরি মনে করা

৭৪] সুরা কাসাস : ৫০।

৭৫] সুরা নিসা : ৩৮।

চাই। এমন যেন না হয় যে, আমাদের দ্বীনি সমস্যাগুলোর জন্য আমরা কোনো আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছি। এটা আমাদের হেদায়াতের জন্য ক্ষতিকর। যেহেতু বিষয়টা দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত, সুতরাং দ্বীন সম্পর্কে ভালো জানেন এমন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কোনো প্রবীণ আলেমের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হবে নিরাপদ।

সিরাত পাঠ করা

নিয়মিত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পাঠ করার দ্বারা অন্তরে নবীজির প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেবে। অন্তরে নবীজির ভালোবাসা থাকলে দ্বীন পালন সহজ হয়ে যাবে। দ্বীনের কোনো বিধানকে আর কঠিন মনে হবে না। ভালোবাসার তাগিদেই তখন সে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করবে। নবীজির সুন্নতের প্রতি যত্নবান হবে। সুবহানাল্লাহ! যে মহব্বতের সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসবেন, তাকে কখনোই তিনি হেদায়াত থেকে বের করে দেবেন না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন।’[৭৬]

সিরাত পাঠের পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করার দ্বারাও ঈমান বৃদ্ধি পায়। দ্বীনের জন্য তাদের ত্যাগ, কুরবানি আমাদের জন্য দিক-নির্দেশনা। কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতে হেদায়াতের ওপর তাদের অবিচলতার ঘটনা আমাদের ঈমানকেও তাজা করে। দ্বীনের জন্য টুটাফাটা ত্যাগ স্বীকার করার জন্য সাহস জোগায়। সাথে সাথে বিভিন্ন দ্বীনি বইপত্র পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দ্বীনি বইগুলো যেন নির্জন দ্বীনি মজলিস। যতক্ষণ কেউ কোনো দ্বীনি বই পড়ে, সে যেন দ্বীনের কথাগুলোই শ্রবণ করতে থাকে হৃদয়ের কানে। তবে বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে

---

[৭৬] সুরা আলে-ইমরান : ৩১।

অবশ্যই সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। যেসব বই অন্তরে সংশয় জাগায় সাধারণদের জন্য তা থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ। সাধারণরা পাঠ করবে এমন বই যাতে সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে, দ্বীন পালনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, দ্বীনের কোনো বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানকে সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে। হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার জন্য তাই দ্বীনি বইপত্র হতে পারে আমাদের নিত্যসঙ্গী।

এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ কিছু বিষয়ে দ্বীনে আসা ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। আশা করা যায় এই বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার দ্বারা হেদায়াতের ওপর টিকে থাকা সহজ হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকেসহ সকলকেই এই বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

হেদায়াত যেভাবে হারিয়ে যায়

কেউ দ্বীনের বুঝ পেয়েছে। দ্বীনের ওপরে চলে। দ্বীন মানার চেষ্টা করে। দ্বীনের ওপর যে চলতে হয়, দ্বীন মানা ছাড়া যে মুক্তি নেই, এটা সে ভালোভাবেই জেনেছে এবং বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এরপরেও দেখা গেল, কিছুদিন পর সে পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে গেছে। হেদায়াত হারিয়ে ফেলেছে। এমনটা কেন হয়? সে কেন হেদায়াত হারিয়ে ফেলে? মূলত হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেগুলোর কারণে বান্দা হেদায়াত পাওয়ার পরেও পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যায়। এখানে কিছু কারণ বিশ্লেষণ করব।

পরিপূর্ণভাবে দ্বীনে প্রবেশ না করা

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

‘হে মুমিনগণ! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।’[৭৭]

] সুরা বাকারা : ২০৮।

পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার অর্থ কী? হেদায়াতের আগে মন্দ যা কিছুতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম সেগুলো পুরোপুরি বাদ দেওয়া। হয়তো তখন সেগুলো ভালো লাগত, কিন্তু হেদায়াতের পর আর ভালো লাগা যাবে না। কিছুসংখ্যক ইহুদি মুসলমান হওয়ার পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে পূর্বে তারা পালন করত এমন কিছু বিষয়ে নবীজির কাছে অনুমতি চায়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন।[৭৮] অর্থাৎ, পূর্বে যা কিছু তারা করত তার সবকিছু থেকে তাদেরকে বের হয়ে আসতে বলেন।

এ জন্য হেদায়াতের পূর্বের সবকিছু থেকে বের হয়ে আসা খুবই জরুরি। অনেক সময় দেখা যায়, এ পথেই অনেকের হেদায়াত হারিয়ে যায় যে, সে পূর্বের কাজগুলো ছাড়তে পারে না। ফলে তার হেদায়াতও স্থায়ী হয় না। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾

> ‘যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারও কাফের হয়েছে এবং কুফরিতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।’[৭৯]

বোঝা গেল, হেদায়াতের পর পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দ্বারা গোমরাহি আরও বেশি বৃদ্ধি পায় এবং এমন ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা পাবে না। তাই পূর্বের অবস্থাকে পুরোপুরি বদলে ফেলতে হবে। সম্পূর্ণভাবে হেদায়াতে প্রবেশ করতে হবে।

হেদায়াতে আসার পরেও ব্যক্তি পূর্বের অনেক কিছু কেন ছাড়তে পারে না—এ প্রসঙ্গে শায়খ আব্দুল আযিয তারিফি হাফিযাহুল্লাহ তার এক গ্রন্থে লিখেছেন, কোনো মানুষ যখন দ্বীন পায়, কিন্তু আগে সে দ্বীনের পথে ছিল না, এমন ব্যক্তি দ্বীনের আসার পর দ্বীনের কিছু প্র্যাকটিস ও তার আগের প্র্যাকটিসের মধ্যে অমিল দেখতে পায়। তখন সে মনে করে যে, তার আগের প্র্যাকটিসগুলো

---

[৭৮] তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা বাকারা : ২০৮।
[৭৯] সুরা নিসা : ১৩৭।

অনেক আপডেটেড ছিল আর দ্বীনের এই দিকগুলো তেমন আপডেটেড না। কেননা সে মনে করে, সে তো আগে অনেক আপডেটেড লোক ছিল, সেই হিসেবে তার আগের প্র্যাকটিসটাই বেশি উন্নত হবে। কিছুদিন পর সে দেখে, দ্বীনে আসার পর তার লাইফস্টাইলের আগের গতিটা আর নেই। তার কাছে মনে হয় দ্বীন পালন করতে গিয়ে সে কিছু স্লো হয়ে গেছে। এই স্লো হওয়ার অনুভূতি থেকে সে পুনরায় কিছুটা পেছনে সরে আসাকে গতিময়তা মনে করে। অথচ এই সামান্য পেছনে সরে আসাটাই তার জন্য পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সে পূর্বের জীবনের মোহকে ভুলতে পারেনি। যার কারণে হেদায়াতে এসে তার মাঝে হীনম্মন্যতা বিরাজ করে। তাই হেদায়াত পাওয়ার পর আমাদের করণীয় হচ্ছে, আগের যে জীবনকে আমরা ছেড়ে আসব তা পুরোপুরি ছাড়ব। আর এখন যখন দ্বীনে প্রবেশ করছি, তখন তাতে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করব।

মনে রাখতে হবে, গন্তব্য পরিবর্তন করে পূর্বের পথেই হাঁটতে থাকা বোকামি। কেননা পূর্বের পথ পথিককে নতুন গন্তব্যে পৌঁছাবে না। বরং পূর্বের ঠিকানায়ই নিয়ে যাবে। তাই হেদায়াতের পর পুনরায় গোমরাহিতে ফিরে যাওয়ার এই বড় কারণ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। দ্বীনে আসার পরেও আগের অভ্যাসগুলোর চর্চা জারি রাখা, আগের ভুল-ভ্রান্তিগুলো সংশোধন না করা, পেছনের ভুল চিন্তার অনুসরণ করতে থাকা, পূর্বের সঙ্গীদের সাথেই মিশতে থাকা, দ্বীনহীন বন্ধুদের রমরমা জীবনযাপন দেখে হীনম্মন্যতায় ভোগা, এগুলো সব হেদায়াত থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ। অনেকে মনে করে, ঠিক আছে আমি দ্বীনে এসেছি ভালো কথা, কিন্তু আমি যেহেতু শিক্ষিত-বুঝবান, আমি দ্বীন ও আধুনিকতার মাঝে কিছুটা ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করি। এই ব্যালেন্স করার মানসিকতাই হেদায়াত কেড়ে নেয়।

প্রবৃত্তির অনুসরণ করা

প্রবৃত্তির অনুসরণ অনেক বড় বড় মানুষকেও গোমরাহ করে ছেড়েছে। আমার মনে যা চায় সেটাকেই ভালো মনে করা, সত্যের বিপরীতে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মর্জিকেই সঠিক প্রমাণ করার মানসিকতা খুবই বিপজ্জনক।

আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে আমরা 'সাদ্দুয যারায়ে' বুঝি না। সবকিছুতে নিজের খেয়াল-খুশিমতো সহজতার তালাশ করি। 'সাদ্দুয যারায়ে' জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলি।

সহজ কথায় 'সাদ্দুয যারায়ে' হচ্ছে ন্যূনতম ক্ষতির পথকে বন্ধ করে দেওয়া, যাতে করে সে পথে বড় ক্ষতি সাধিত না হয়। যেমন ধরুন, আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। এখন ব্যভিচার পর্যন্ত যাতে কেউ পৌঁছতে না পারে সে জন্য ব্যভিচার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে এমন সবকিছুই হারাম করে দিয়েছেন। পরনারীকে দেখা, তার সাথে কথা বলা, নির্জনে অবস্থান করা, পরপুরুষের সাথে আকর্ষণীয় স্বরে কথা বলা ইত্যাদি সবকিছুকেই হারাম করে দিয়েছেন। আমাদের মনে হতে পারে যে, একবার-দুবার কোনো নারীর সাথে একান্তে কথা বলার দ্বারা তো কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দরকার ছিল না। কিন্তু শরিয়ত দেখছে, একবার-দুবার হতে হতে একসময় শয়তান তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করে দেওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং এই পথকেই যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তা আর বড় ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। এ জন্য 'সাদ্দুয যারায়ে' হিসেবে ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে এই বিষয়গুলোকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা মদকে হারাম করছেন। কেন হারাম করছেন? এটা নেশা জাগায়। মানুষকে গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়। তার মানে আল্লাহ তাআলা মদকে হারাম করার প্রধানতম কারণ হচ্ছে নেশা সৃষ্টি হওয়া। এখন কেউ যদি বলে, আমি এক ফোঁটা মদ খেলে তো নেশা হবে না, তাহলে কি এক ফোঁটা মদ খাওয়া হালাল হবে? এক ফোঁটাতে নেশা না জাগলেও তা বৈধ হবে না, বরং হারামই থেকে যাবে। এখন আমরা ভাবতে পারি যে, এখানে তো নেশা তৈরি হচ্ছে না, সেই হিসেবে হারামের কারণ অনুপস্থিত থাকার দরুন এই এক ফোঁটা হারাম না হওয়ার কথা। কিন্তু শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী বড় ক্ষতির পথকে রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই এক ফোঁটাকেও হারাম করা হয়েছে। কেননা এক ফোঁটা খাওয়া মানে আস্তে আস্তে তা এক পেয়ালার দিকে যাওয়া। এক পেয়ালা থেকে এক গ্লাসের দিকে যাওয়া। এভাবে পুনরায় মদ্যপানের দিকেই ফিরে যাওয়া।

এ জন্য প্রবৃত্তির চাহিদার পক্ষে যুক্তি খোঁজা যাবে না। শরিয়ত যেই হুকুম যেভাবে বলেছে, সেই হুকুমকে সেভাবেই পালন করতে হবে।

অনুশোচনাবোধ না থাকা

অনেকেই আমরা দ্বীনে আসার পর টুকটাক দ্বীন তো মানার চেষ্টা করি, কিন্তু পূর্বের দ্বীনহীন কেটে যাওয়া সময়ের জন্য আমাদের মাঝে বিশেষ কোনো আফসোস-অনুশোচনা থাকে না। অথচ আগের জীবনের ওপর যদি অনুশোচনা,

আক্ষেপ থাকত, তাহলে পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়া সহজ হতো না। অবশ্য দেখা যায়, দ্বীনের আসার পরেও আমাদের দ্বারা অনেক রকম গুনাহ হয়ে যায়, কিন্তু সেগুলোর ব্যাপারেও আমাদের মাঝে অনুশোচনা নেই। তাওবা-ইস্তেগফারের দিকে ছুটে যাওয়ার তাড়া নেই। দেখুন, আমরা কেউই ফেরেশতা না। আমাদের দ্বারাও গুনাহ হয়। কিন্তু সেই গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তো হবে না। তাওবা ভুলে গেলে তো চলবে না। গুনাহের পর তাওবার প্রতি যত্নবান না হওয়ার কারণে অনেকেই হেদায়াত থেকে ছিটকে পড়ে।

গুনাহের পক্ষে ওজর খোঁজা

অনেকেই আছে তার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলে, বা কেউ তার কোনো ভুল ধরিয়ে দিলে, সে অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে উলটো নানা যুক্তি দিয়ে নিজের কৃত গুনাহকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে। এটা খুবই মারাত্মক প্রবণতা। এর ফলে অন্তরে অন্ধকার জন্ম নেয়। অন্তর শক্ত হয়ে যায়, অন্তর থেকে হেদায়াতের নূর চলে যায়।

অন্যকে হেয় করা

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া। এটা এ জন্য বললাম, কেননা অনেকের আচরণ দেখলে এমনই মনে হয়, যেন সে নিজের হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে অন্যকে তিরস্কার করতে থাকে, বয়সে অনেক বড় এমন প্রবীণদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করতে থাকে। এখন তো অনেক ভাই সরাসরি আলেমদের সাথে বিতর্কে নেমে যায়, অনেককে সুস্পষ্ট বেয়াদবিও করতে দেখা যায়। একজন ব্যক্তি নিজের হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে গেলে এমনটা কীভাবে করতে পারে? মূলত এর দ্বারা অহংকার প্রকাশ পায়। আর অহংকারী ব্যক্তির জন্য হেদায়াতের টিকে থাকা দুষ্কর।

কেউ যখন নিজের হেদায়াতের ব্যাপারে বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তার কথায়-কাজে অহংকার প্রকাশ পায়, আর অন্যদের ছোট করতে থাকে। আল্লাহ তাআলাও তার থেকে হেদায়াত ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তাকে লাঞ্ছিত করেন।

অন্যের সমালোচনা

বর্তমানে দ্বীনি কমিউনিটির একটা কমন রোগ হচ্ছে নিজের সংশোধনের কথা ভুলে গিয়ে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করা। আচ্ছা মনে করুন, কোনো ব্যক্তির মাঝে দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, সেটা নিয়ে নাহয় সমালোচনা করার বিষয়টা ছাড় দিলাম। কেননা হতে পারে সেই ব্যক্তির

অনুসরণে আরও অনেকে সেই ভুলে লিপ্ত হতে পারে—এমন চিন্তা থেকে তার সমালোচনা করা হচ্ছে, যাতে করে কেউ তার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, যেহেতু বিষয়টা দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কারও ব্যক্তিজীবন বা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে পাবলিকলি সমালোচনা করার কী অর্থ? এর দ্বারা কি সমালোচনাকারী ব্যক্তির ঈমান ও হেদায়াতের ক্ষতি হচ্ছে না? কোনো মুমিনের ব্যাপারে অমূলকভাবে মন্দ ধারণা করা, তার দোষ খুঁজতে থাকা, নানাভাবে তাকে হেয় করার চেষ্টা করা, কারও পার্সোনাল বিষয় নিয়ে চর্চা করা—এগুলো সবই হারাম। তাহলে কোনো ভাই দ্বীনে আসার পরেও যদি এসব হারাম কাজে লিপ্ত থাকে, তার হেদায়াত কী করে স্থায়ী হবে?

মেয়ে সহপাঠীদের ব্যাপারে সতর্ক না হওয়া

এটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। এমনিতেই নারীর ফেতনা পুরুষের জন্য সর্বাধিক মারাত্মক ফেতনা। দ্বীনে ফেরার পর এই পথেই অনেকের হেদায়াত হারিয়ে যায়। দেখা যায়, অন্যান্য পরনারীর ব্যাপারে সতর্ক থাকলেও অনেকেই তার মেয়ে সহপাঠীদের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে না। কিন্তু গুনাহ তো গুনাহ-ই। গুনাহের কারণে অন্তর কলুষিত হতে হতে একসময় তা হেদায়াতকে ধারণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই সব ধরনের গুনাহের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

স্বল্প পরিসরে বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হলো। আল্লাহ তাআলা এই আলোচনাকে আমাদের জন্য উপকারী বানান। এর ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেন এবং আমাদের সকলকে হেদায়াতের ওপর অবিচলতা দান করুন। আমিন।

চতুর্থ পর্ব

আল্লাহর আজাব হতে কেউ নিরাপদ নয়

✍ মো. শরীফ আবু হায়াত

আল্লাহর আজাব হতে কেউ নিরাপদ নয়

সুরা মাআরিজের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও পরকালের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, অপরাধীরা কোনোভাবেই সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। অপরাধীরা সেদিন নিজের পরিবার-পরিজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, এমনকি দুনিয়ার সকল মানুষের বিনিময়ে হলেও নিজেকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে,

﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ﴾

'কখনোই এটা সম্ভব হবে না। তা এক লেলিহান আগুন; যা চামড়া খসিয়ে দেবে।'[৮০]

অর্থাৎ, অপরাধীরা কোনোকিছুর বিনিময়েই সেদিন নিজেকে এই লেলিহান আগুনের শাস্তি হতে বাঁচাতে সক্ষম হবে না।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই সকল ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরেছেন, যারা সেদিনের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের পরিচয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তারা নিয়মিত সলাত কাইয়েমম করবে, সালাতের হেফাজাতকারী হবে, জাকাত আদায়কারী হবে, কেয়ামত দিবসকে সত্যায়ন করবে, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী হবে, তারা আমানতদার হবে, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হবে—এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বান্দাদের অনেকগুলো সিফাত তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লেখ করেছেন

﴿وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ﴾

'এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।'[৮১]

---

[৮০] সুরা মাআরিজ : ১৫-১৬।

[৮১] সুরা মাআরিজ : ২৭।

অর্থাৎ, ওই সমস্ত লোকেরাই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতবাসী হবে যারা নামাজ, জাকাত, কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস, লজ্জাস্থানের হেফাজত, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার আজাব সম্পর্কে ভীত থাকবে। যে জাহান্নামের শাস্তিকে ভয় করবে সে-ই মূলত জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে। কেননা আজাবের ভয় তাকে নেক কাজের ওপর ওঠাবে এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত রাখবে। যার মাঝে পরকালের শাস্তির ভয় নেই সে তো লাগামহীন চলবেই।

এরপর এই আয়াতের পরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জানিয়েছেন যা হেদায়াত লাভের পর পুনরায় তা হারিয়ে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন,

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾

> 'নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয়, যা হতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।'[৮২]

অর্থাৎ, আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচার ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত নয়। বরং তা এমন জিনিসই নয়, যা থেকে নিশ্চিত থাকা যায়।

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলার আজাব হচ্ছে 'গইরু মা'মুন' (غَيْرُ مَأْمُونٍ)। মা'মুন শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। আমাদের দেশে এটা খুব কমন একটা শব্দ। আমাদের চারপাশের অনেক মানুষের নাম মামুন। যদিও আমরা 'মামুন' 'মামুন' উচ্চারণ করি, আসলে শব্দটা হচ্ছে মা'মুন। মামুন মানে হচ্ছে 'আমানপ্রাপ্ত' হওয়া। অর্থাৎ, যাকে আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তাকে মা'মুন বলা হয়। সুতরাং এই আয়াতে 'গাইরু মা'মুন'-এর অর্থ দাঁড়াবে 'আল্লাহর আজাব এমন জিনিস, যা থেকে কেউই নিরাপদ নয়।'

সুবহানাল্লাহ! কত ভয়ের কথা। অথচ এদিকে আমরা নিজেদের নিরাপদ ভেবে বসে আছি। কিছু নামাজ, রোজা পালন করে নিজেদের জান্নাতি মনে করছি। অথচ আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে ভীত থাকাও জান্নাতিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

---

[৮২] সূরা মাআরিজ : ২৮।

কিন্তু সেই ভয় কি আজকে আমাদের মাঝে আছে? যার মাঝে পরকালের শাস্তির ভয় নেই, সে তো হেদায়াত থেকে দূরে সরবেই। সে নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তার মাঝে অহংকার সৃষ্টি হবে। আর অহংকারী কখনো হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে পারে না। তার অহংকার-ই তাকে হেদায়াত থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

কারা আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ?

যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, অর্থাৎ নবী-রাসুলগণ আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ কারণ তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের বার্তাবাহক হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং পাপের ঊর্ধ্বে মাসুম বানিয়েছেন এবং আজাব থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। এটা নবী-রাসুলদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

> 'আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'[৮৩]

বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলা যখন সাহাবিদের ব্যাপারে নিজের সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন, সুতরাং তারাও আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ। কারণ, আল্লাহ যাদের ওপর সন্তুষ্ট, তাদেরকে তিনি আজাবে নিক্ষেপ করবেন না। এ ছাড়াও সময়ে সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে বিভিন্ন সাহাবিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন, আমরা 'আশারায়ে মুবাশশারা' তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি সম্পর্কে জানি। দুনিয়াতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতবাসী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের ব্যাপারেও জাহান্নাম হতে মুক্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের এক মজলিসে বললেন,

يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ

---

[৮৩] সুরা তাওবা : ১০০।

يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ". ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

‘আমার উম্মত থেকে কিছু লোক দল বেঁধে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় জ্বলজ্বল করবে। (বর্ণনাকারী) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এ কথা শুনে উক্কাশা ইবনে মিহ্সান আসাদি তার গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার জন্য দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি একে তাদের মধ্যে শামিল করুন। অতঃপর আনসারদের থেকে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করেন। এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে।’[৮৪]

অর্থাৎ, এখন আর সুযোগ নেই। সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা দেখলাম হযরত উক্কাশা (রাঃ)-কে এই হাদিসে সুসংবাদ দিয়ে দেওয়া হলো। পরের আনসারি সাহাবি কিন্তু সেই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।

স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি কাউকে নিরাপত্তা প্রদান করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে কারও নিরাপত্তার ঘোষণা করেন বা কাউকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনান, তাহলে তার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, তিনি আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ। আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু এর বাইরে অন্য কেউই আল্লাহর আজাব থেকে নিরাপদ না। বরং আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, সকল মানুষ ক্ষতির মাঝে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾

---

[৮৪] সহিহ বুখারি : ৬৫৪২।

'কালের শপথ! বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে।'[৮৫]

সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতির মাঝে থেকে আবার আজাব থেকে নিরাপদ হয় কী করে? তাই নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আজাবকে ভয় করা চাই।

নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা

হেদায়াত পাওয়ার পর কোনো ব্যক্তি নিজের নাজাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ আমাদের কথা কাজে কিন্তু মনে হয় আমরা জান্নাতের চাবি নিয়ে বসে আছি! অথচ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেও হজরত আবু বকর (রাঃ) এর অবস্থা কী ছিল? তিনি একবার নিজেকে মুনাফিক পর্যন্ত মনে করেছিলেন!

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া ও কাতান ইবনু নুসায়র (রহ.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাতিব হানযালা আল উসায়দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ, হে হানযালা? তিনি বলেন, আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ তুমি কি বলছ? তাকে [হানযালা (রা.)] বলেন, আমি বললাম, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসি, অবস্থান করি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন চোখ দিয়ে আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে বের হয়ে নিজেদের স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদের মাঝে ডুবে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছু ভুলে যাই। আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমারও তো এই অবস্থা।[৮৬]

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত, রাসুলুল্লাহ জান্নাতে যার জন্য বালাখানা প্রস্তুত দেখে এসেছেন, সেই উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা দেখুন। তিনি বলতেন, যদি এই উম্মতের সবাইকে জান্নাতে

---

[৮৫] সুরা আছর : ১-২।
[৮৬] সহিহ মুসলিম, ৬৭১৩

দেওয়া হয় শুধু একজনকে ছাড়া, তাহলে আমি ভয় পাব যে আমিই সেই একজন।[৮৭]

সুবহানাল্লাহ! তাঁদের এই অবস্থাগুলোর মাঝে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আপনাদের কী মনে হয়, তাঁদের এই ভয় কৃত্রিম ছিল? নিছক মৌখিক বিনয় প্রকাশ ছিল? আদৌ কি কোনো কৃত্রিমতা তাঁদের মাঝে ছিল? নাহ, তেমন কিছুই না। এ কথাগুলো তাঁরা নিজেদের অন্তরের হাকিকত থেকেই বলেছেন। সত্যি সত্যি-ই তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে ভয় করতেন। মূলত তাঁদের অন্তরের এই অবস্থাটা বাস্তব ও সত্য ছিল বলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতেই তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাজিল করেছেন। তাকে জাহান্নামি ঘোষণা করেছেন। কেন? কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। তিনি পূর্বের, পরের সবকিছু সম্পর্কে জানেন। আবু লাহাবের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা জানেন যে, সে কখনো হেদায়াত পাবে না, ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য তার হবে না, তাই আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে ধ্বংসের ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে হজরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, আশারায়ে মুবাশশারাহ—তাঁদের সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা জানেন যে, তারা কখনো হেদায়াত থেকে গোমরাহিতে ফিরে যাবে না। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে সে সময়ের সকল মুসলমানের জন্য কিন্তু এই ঘোষণা দেননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা জানেন যে, এদের সবাই হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে পারবে না।

এ জন্যই তো দেখা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগের সময়ে কেউ কেউ নিজেকে নবী দাবি করে বসেছে। আবার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর অনেক মানুষ মুরতাদ হয়ে গেছে। বোঝা গেল, সকলেই হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না যে, তারা হেদায়াতের ওপর অবিচল থেকে ইহকাল ত্যাগ করতে পারবে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবাইকে আমভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দেননি।

আমাদের ব্যাপারেও কিন্তু এমন কোনো গ্যারান্টি আসেনি। এই যে যারা মুরতাদ হয়ে গেল, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাহলে বুঝুন, রাসুলের সময়ে হেদায়াতে এসেও শেষ পর্যন্ত সবাই

---

[৮৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৫৩

হেদায়াতের ওপর টিকে থাকতে পারেনি। তাহলে আমাদের অবস্থান কোথায়? সুতরাং সাবধান! নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। বরং এই ভয় থাকতে হবে যে, না জানি আমার কোনো পাপের কারণে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। আসলে কখন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কার প্রতি স্বীয় রহমতের দৃষ্টি দেন, আর কখন যে কাকে নিজের রহমত থেকে সরিয়ে দেন, সেটা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

সেদিন একটা ছেলের সাথে কথা হচ্ছিল। ছেলেটা সারা দিন গেমস খেলত, ধূমপানে আসক্ত ছিল, গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘুরাঘুরি, ফ্রি-মিক্সিং— এ রকম নানাকিছুতে ডুবে ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো যে, এটা তো কোনো লাইফ হতে পারে না। ব্যস, এরপর থেকেই সে পরিবর্তন হতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ইসলামের ব্যাপারে খোঁজ নিলো। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করল এবং এখন সে হেদায়াতের ওপর চলার চেষ্টা করছে। দ্বীনে আসার পর এখন তার ফিলিং হচ্ছে, আমি তো বেঁচে গেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আবার এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, বড় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তিও সারা জীবন দ্বীনের ওপর থেকে মৃত্যুর পূর্বে হেদায়াত থেকে ছিটকে পড়েছেন।

আমি মো. শরীফ আবু হায়াত, আমি বই লিখেছি, বিভিন্ন প্রোগ্রামে কথা বলি, বহু মানুষ আমাকে চেনে, ভালো মানুষ হিসেবে জানে, মনে করে ভাই তো মাশাআল্লাহ অনেক ভালো কাজ করছে, বহু মানুষ আমাকে সম্মান করে।

রাস্তায় যখন মানুষ আমাকে সালাম দেয়—সবাই আমাকে চেনে না, জাস্ট আমার জুব্বার জন্য, আমার টুপির জন্য, শুধু আমার এই বাহ্যিক বেশভূষার জন্যই আমাকে সালাম দিচ্ছে। এটা একটা সম্মান। আমার দ্বীনি লেবাসের জন্য আমি এই সম্মানটা পাচ্ছি। অনেক সময় অনেক মানুষ দ্বীনের খাতিরে আমাকে একটা হাদিয়া দেয়, গিফট দেয়—এটাও একটা সম্মান। মানুষ যখন আমাকে ভালো মনে করছে, আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করছে—এই সম্মানটাও কিন্তু আমি দ্বীনের কারণেই পাচ্ছি। এগুলো কিন্তু দুনিয়াতেই পাচ্ছি। এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে, আমার তো ভয় হয় যে, হয়তো আমি দুনিয়াতে ভালো কিছু কাজ করেছি, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতেই আমাকে সেসব কাজের প্রতিদান দিয়ে দিচ্ছেন। এমন হলে তো সবকিছু শেষ, দুনিয়াতেই হিসাব বরাবর হয়ে গেল, পরকালে আমার জন্য কিছুই থাকল না।

আজকে মানুষ আমাকে ভালো মনে করছে, অথচ হয়তো আমি কোনো ভুল করে ফেলব মৃত্যুর আগে, অথবা অহংকার চলে আসবে আমার মনে, কিংবা

আমি কোনো বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে যাব, ফলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আজাবে নিক্ষেপ করবেন। দিনশেষে কারও কোনো গ্যারান্টি নেই।

মানুষ মনে করে, হয়তো এখানে একটা নিশ্চয়তা আছে। আগে যেহেতু নানা রকম গোমরাহিতে ছিলাম, আর এখন সেগুলো বর্জন করেছি, পুরোপুরি বের হয়ে এসেছি, এখন তো নেক আমল করছি, দ্বীনের ওপর চলার চেষ্টা করছি, তার মানে সে ধরে নেয় যে, সে এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে। অথচ ব্যাপারটা কিন্তু এমন না। আমাদের কিন্তু নিজেকে আরও উন্নত করতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে, পানির মধ্যে একটা শোলার ভেলা ভেসে আছে। এখন পানি কম; ভেলাটা পানির ওপর ভাসমান। একটু পর সেই পানি বাড়ার সাথে সাথে ভেলাটাও কিন্তু নিজেকে পানির ওপর ভাসমান রেখেই ওপরে ওঠবে। ডুবে গেলে কিন্তু চলবে না। ঠিক একইভাবে হেদায়াতে আসার পর আমাদের দায়-দায়িত্ব বেড়ে যায়। যখন আমি দ্বীন বুঝতাম না তখন হিসাবটা ছিল একরকম। এখন দ্বীনের বুঝ পাওয়ার পর কিন্তু আগের হিসাবটা বদলে যাবে। দ্বীন বোঝে না এমন লোকদের জন্য যেটা হয়ত আল্লাহ রাহমানুর রাহীম ছাড় দেবেন, দ্বীনদার লোকের জন্য কিন্তু একই কাজকে আল্লাহ অপরাধ হিসেবে ধরতে পারেন। এটা মাথায় রাখতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে একটা জিনিস জানার ও বোঝার তাওফিক দিয়েছেন, এখন সে বিষয়ে আমার থেকে কৈফিয়তটাও সেভাবেই নেবেন। মোটকথা, উত্তরোত্তর নিজের মাঝে উন্নতি ও অগ্রগতি আসতে হবে। এক অবস্থার ওপর নিশ্চিত হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

অহংকার করা যাবে না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাকে হেদায়াত দিয়েছেন, দ্বীনের পথে এনেছেন, তার সেটা নিয়ে অহংকার করা যাবে না। বরং তাকে বিনয়ী হতে হবে। সমস্ত নবী-রাসুল বিনয়ী ছিলেন। কারও মেধা বেশি, বুঝে নিতে হবে তার দায়িত্বও বেশি। যাকে আল্লাহ অধিক মেধা দিয়েছেন, তার থেকে হিসাবটাও অধিক নেবেন। ভালোর কোনো শেষ নেই। চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত নিজের কোনো অবস্থার ওপরই অহংকার করার কিছু নেই। আর জান্নাতে যাওয়ার পর তো সেখানে অহংকারের অস্তিত্বই থাকবে না। তাই আল্লাহ যাকে দ্বীনের বুঝ দিয়েছেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে আরও বেশি জানতে হবে, পরিপূর্ণভাবে দ্বীন মানতে হবে, নিজের উন্নতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে।

অন্যকে নিয়ে নাক সিটকানোর সময় কোথায়। অন্যদেরকে আমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য কীভাবে করতে পারি, আমি নিজেই তো দুদিন আগে তাদের মতো ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দয়া করে আমাকে হেদায়াতের পথে এনেছেন। তাই কোনোভাবেই কোনো ধরনের অহংকার যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

আমরা যেন শয়তানের ধোঁকায় না পড়ি

আবার অনেকে আত্মতৃপ্ত হয়ে যায় এই ভেবে যে—আমি তো ভাই অনেক ভালো। বহু মানুষের থেকে অনেক ভালো। আমি ভালো কাজ করি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, মসজিদে যাই, তাহাজ্জুদ পড়ি, আমি তো আরবি শিখছি, আরবি বলতে পারি, কুরআনের তরজমা করতে পারি, এ রকম অনেকের অনেক বিষয় আসতে পারে। এটা কিন্তু আসলে শয়তানের একটা কৌশল। শয়তান প্রথমে মানুষকে খারাপ জিনিস দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। নারী, ড্রাগস, মুভি, মাদক ইত্যাদি যেটা দিয়ে যাকে ভুলিয়ে রাখা যায়। কিন্তু যখন কেউ ড্রাগস, মুভি, মাদক এগুলো থেকে বের হয়ে আসে এবং ভালো কাজ করতে শুরু করে, তখন শয়তান তাকে ভালো কাজ দিয়েই ধোঁকায় ফেলে। প্রথমত, শয়তান চেষ্টা করে তাকে অপেক্ষাকৃত কম ভালো কাজে নিয়ে আসার। কারণ, সে তো সরাসরি মন্দ কাজের দিকে যাবে না। এভাবে তাকে কম কোয়ালিটির দিকে আনতে আনতে একসময় আবার মন্দ কাজে লাগিয়ে দেয়। আবার এমন হয়, শয়তান একটা ভালো কাজকে তার কাছে অনেক বড় করে উপস্থাপন করে, তার মনে একটু একটু করে অহংকার ঢালতে থাকে। শয়তান তাকে বোঝায় যে, তুমি তো অনেক ভালো মানুষ হয়ে গেছ, অনেক দূর এগিয়ে গেছ, তুমি তো এখন আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা, আল্লাহ তোমাকে আজাব দেবেন না। ফলে সে ধোঁকায় পড়ে যায়, নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করে, নিজের আমলের ওপর অহংকার চলে আসে, এভাবে শয়তান অত্যন্ত কৌশলে হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুনরায় গোমরাহিতে নিমজ্জিত করে দেয়।

কৃত্রিমতা নয়, চাই বাস্তব অনুভূতি

বলছিলাম, এই যে নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনে করা, নিজেকে নিরাপদ ধরে নেওয়া, নিজেকে জান্নাতের সার্টিফিকেটধারী মনে করা বা জান্নাত প্রাপ্তির

ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাওয়া—এগুলো খুবই ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক। যদিও আমরা সবাই মুখে এ কথাই বলি যে, আমি তো নিজেকে তুচ্ছ মনে করি, নিজেকে জাহান্নামের কীট হিসেবেই দেখি, আমার চেয়ে নগণ্য দুনিয়াতে আর কেউ নেই; কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে এগুলো কি আমরা মন থেকে বলছি, নাকি বাহ্যিক ভদ্রতা বা বিনয় দেখাচ্ছি? কথাগুলো কি আমার মন থেকেই আসছে, নাকি আমি একটা কৃত্রিম ভাব নিচ্ছি। এই বিষয়টা আমাদের নিকট ক্লিয়ার থাকা জরুরি। কেননা মুখে বলা আর অন্তর থেকে উপলব্ধি করা এক জিনিস না। অন্তরে উপলব্ধি না থাকলে মুখের এই কৃত্রিমতা বরং আরও গোমরাহির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই আমাদের অন্তরকে প্রস্তুত করতে হবে। মুখের কথাকে অন্তরে বাস্তবতা বানিয়ে নিতে হবে। এটা খুবই জরুরি।

বস্তুত অহংকারের কারণেই মানুষ হেদায়াত পায় না, কারণ যে অহংকারী সে হেদায়াতের যোগ্য না। আবার হেদায়াত পেলেও তা টিকিয়ে রাখতে পারে না। নানা রকম কৃত্রিম চটকদারিতা, বাহ্যিক ভাব-ভঙ্গিমা, শয়তানের ধোঁকা আর অন্তরের অহংকারের ছিদ্র দিয়েই হেদায়াত হারিয়ে যায়। কেউ যখন নিজেকে নিরাপদ মনে করে, নিজের ইবাদতগুলোকে যথেষ্ট মনে করে, নিজের হেদায়াতপ্রাপ্তি নিয়ে অহংকার প্রকাশ করে, অন্যকে তাচ্ছিল্য করে, তখন সে ব্যক্তি হেদায়াতের ওপর স্থায়ী হতে পারে না।

হেদায়াত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ

আমি একসময় খুব হয়রান হয়ে থাকতাম এই ভেবে যে, আল্লাহ কুরআনে বারবার এভাবে কেন বললেন যে, হেদায়াত আমার হাতে, যে কেউ চাইলে কাউকে হেদায়াত দিতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও একাধিকবার এ কথা বলেছেন যে, তারা হেদায়াতে না এলে আপনি অস্থির হয়ে যাবেন না। আপনার দায়িত্ব শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। হেদায়াত তো আমার হাতে। আমি যাকে খুশি তাকেই হেদায়াত দেবো। আপনি চাইলেই কাউকে হেদায়াতে আনতে পারবেন না। এটুকু তো সহজে বোঝা যায় যে, দাওয়াত দিতে গিয়ে কেউ যেন মন খারাপ না করে, হতাশ না হয় – কারণ হেদায়াত কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতে বা কারও মর্জির অধীনে নয়, কেউ চাইলেই যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দিতে পারবে না, শুধু আল্লাহ হিদায়াত দিতে পারেন।

কিন্তু এই একাধিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কথাটা এতবার বলেছেন, এটা নিয়ে আমার মাঝে প্রশ্ন ছিল। পরে কোনো এক এক্তেকাফে আল্লাহ আমাকে দয়া করলেন। আমার মনে হলো, হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হেদায়াত সম্পর্কে বারবার এভাবে বলার দ্বারা একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দা যেন হেদায়াতপ্রাপ্তিকে নিজের কৃতিত্ব বা কামালিয়াত মনে না করে। কারও মনে যেন এই ধারণা না আসে যে, সে নিজ যোগ্যতার কারণে হেদায়াতে আসতে পেরেছে। সুতরাং কেউ যেন হেদায়াতকে তার নিজের মেধা, যোগ্যতা ও নিজের কোনো কর্মের সাথে সম্পৃক্ত না করে। বরং হেদায়াত মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। তিনি যার ব্যাপারে ইচ্ছে করেন কেবল সে-ই হেদায়াতে আসতে পারে। সুতরাং কেউ এমন ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, আমি তো অনেক বেশি বইপত্র পড়ি, বা আমার মেধা বেশী, বা বোঝার ক্ষমতা বেশী, অথবা আমি তো অনেক চিন্তাশীল মানুষ,—এসব কারণেই আমি দ্বীনকে বুঝতে পেরেছি এবং হেদায়াত লাভ করেছি। কেননা এগুলো হচ্ছে একেকটা মাধ্যম। আর মাধ্যম অবলম্বন করলেই সফলতা আসা বা কার্যসিদ্ধি হওয়া জরুরি না। মাধ্যমের অধিকারী হয়েও অনেকে সফলতার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সফলতা তো আল্লাহর হাতে। তাঁর অনুগ্রহ তিনি যাকে চান তাকেই দান করেন। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করলেই যদি হিদায়াত পাওয়া যেত তাহলে অনেক খ্রিষ্টান ওরিয়েন্টালিস্ট আর খ্রিষ্টান থাকত না, মুসলিম হয়ে যেত। জ্ঞান বা মেধা যদি ইসলামগ্রহণের জন্য অপরিহার্য হতো তাহলে কয়জন কৃষক, জেলে, রিকশাওয়ালা মুসলিম হতে পারত?

এ জন্য আমাদের বোঝা উচিত যে, আমার নিজের কোনো যোগ্যতা বা নিজের কোনো একটিভিটির কারণে আমি হেদায়াত পেয়েছি। এ রকম কোনো চিন্তাই যেন আমাদের মাথায় না আসে। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ দয়ায় আমাকে হেদায়াতের পথে এনেছেন। এই শিক্ষা অর্জনের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতিরা বলবে,

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

‘আর তারা বলবে, সমস্ত হামদ-প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে না পৌঁছালে আমরা কখনোই (এ স্থলে) পৌঁছতে পারতাম না।’[৮৮]

[৮৮] সূরা আরাফ : ৪৩।

মুমিনের অবস্থান ভয় ও আশার মাঝামাঝি

হেদায়াত লাভের পর করণীয় হচ্ছে আমরা নিজেরা দ্বীন পালনে সচেষ্ট থাকব। অন্য ভাইদের মাঝেও দাওয়াতের কাজ করব। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। তবে আমরা কখনো নিজেদের হেদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হব না। নিজেদের শেষ পরিণাম নিয়ে চিন্তিত থাকব। আবার আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। কেননা মুমিনের অবস্থান হচ্ছে بين الخوف و الرجاء অর্থাৎ, ভয় ও আশার মাঝামাঝি। মুমিন কখনো নিজের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত থাকতে পারে না। কারণ, সে তো আল্লাহর আজাবকে ভয় করে। আল্লাহর ক্রোধকে ভয় করে। আবার একইসাথে সে আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের আশা রাখে। মুমিন বান্দা ভয় ও আশা—এই দুই অবস্থার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে। এমন হয় না যে, নিজের ঈমাল-আমলের ওপর অনেক বেশি আশান্বিত হয়ে আল্লাহর আজাবকে ভুলে যায়। আবার এমনও হয় না যে, নিজের গুনাহ, অপরাধ ও আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে হতাশায় পড়ে যায়। দ্বীনে আসার পর এই ব্যালেন্সটা অনেক বেশি জরুরি। এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমান,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

'আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।'[৮৯]

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে ধারণাকে সুন্দর করতে হবে। কেননা বান্দা যেমন ধারণা করবে আল্লাহ তাআলা তেমনই আচরণ করবেন। বান্দা যখন আল্লাহর আজাবকে ভয় করবে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সেই আজাব থেকে মুক্তি দেবেন। আবার বান্দা যখন আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে স্বীয় রহমতের চাদরে আবৃত করে নেবেন। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

لاَ يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ.

---

[৮৯] সহিহ বুখারি : ৭৪০৫।

‘তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে।’[৯০]

আল্লাহ তাআলা নিজেও বান্দাকে আশা এবং ভয়—এই দুই অবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

‘আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে আমাকে ভয় করো।’[৯১]

আল্লাহ তাআলা অসংখ্য আয়াতে বান্দাকে তার আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ফরমান,

﴿اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾

‘নিশ্চয় এর (জাহান্নামের) শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।’[৯২]

একইসাথে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ হতেও নিষেধ করেছেন। বারবার তাদেরকে ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছেন। নিজের পরিব্যাপ্ত রহমতের আশার বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

‘বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[৯৩]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۗءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾

---

[৯০] সুনানু আবি দাউদ : ৩১১৩।
[৯১] সুরা আলে-ইমরান : ১৭৫।
[৯২] সুরা ফুরকান : ৬৫।
[৯৩] সুরা যুমার : ৫৩।

> ‘আল্লাহ বললেন, আমি আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা করি দিয়ে থাকি; আর আমার দয়া তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।’[৯৪]

এভাবে পুরো কুরআন মাজিদ জুড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনো বান্দাকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন, আবার কখনো জান্নাতের আশা দেখিয়েছেন এবং সব শেষে বান্দার জন্য তাঁর রহমত হতে নিরাশ হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।

তাই আমরা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও আজাবের ভয়ে সব সময় বিনয়ী হয়ে থাকব, নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখব এবং অহংকার বর্জন করব। আল্লাহর আজাব থেকে কখনো নিজেকে নিরাপদ মনে করব না। আবার একইসাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ অনুগ্রহ ও অপার দয়ার কথা চিন্তা করে হতাশা থেকে দূরে থাকব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিস্তৃত ক্ষমা ও পরিব্যাপ্ত রহমতের ওপর ভরসা করে নেক আমল করতে থাকব।

শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে প্রশ্রয় না দেওয়া

মাঝে মাঝে অনেকের এমন হয়—ঠিকমত নামাজ-রোজা আদায় করছে, হালাল-হারাম বেছে চলছে, পর্দা মেইনটেইন করছে, অন্যান্য আমলগুলোও যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তার মনে হয় যে, তার ঈমান ঠিক নেই, ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তার আমলগুলো সুন্দরমতো হচ্ছে না, হয়তো আমলগুলো আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না। কখনো মনে হয় সে হয়তো হেদায়াত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অন্তরটা কেমন শূন্য শূন্য অনুভূতি হয়। এ রকম নানা ওয়াসওয়াসা তাকে পেরেশান করে তোলে। মনে রাখতে হবে, এটা শয়তানের ধোঁকা। বাস্তবতা তো হলো, ওভাবে পরিপূর্ণ আমল আমরা কেউই করতে পারি না। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে নিজেদের ঈমান, আমল, কুরবানিগুলো পেশ করেছেন, আমাদেরটা তো সে রকম হয় না। নামাজে দাঁড়ালে আমাদের দেহ থাকে মসজিদে আর মন ঘুরতে থাকে সারা বিশ্বজুড়ে।

---

[৯৪] সুরা আরাফ : ১৫৬।

নিজের আমলকে উন্নত থেকে বেশি আরও উন্নত করতে হবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু কোনোভাবেই শয়তানের খপ্পরে পড়া যাবে না। অনেক সময় শয়তান নেক সূরতে আমলের ঘাটতি দেখিয়ে ধোঁকা দেয় এবং আমল থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করে। মুমিন বান্দার মাঝে কখনো কখনো এমন অতৃপ্তির অনুভূতি সৃষ্টি হবে—এটা তার ঈমানেরই আলামত। সাহাবায়ে কেরামেরও এমনটা হয়েছে। হানযালা রা.-এর হাদিসটা কিছুক্ষণ আগেই আপনারা পড়ে এসেছেন।

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কয়েকজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু খটকার সৃষ্টি হয় যা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করাকেও মারাত্মক মনে করে। তখন রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তোমাদের এমনটা হয়? তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ

'এটিই স্পষ্ট ঈমান।'[৯৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে স্পষ্ট ঈমান বলেছেন। কারণ, ঈমান আছে বলেই তারা অন্তরের সেই ওয়াসওয়াসাকে মারাত্মক মনে করেছেন।

সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের মনেই নিজেদের ঈমান ও আমলের ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা এসেছে, সেখানে আমাদের বেলায় তো শয়তান আরও বেশি শক্তিশালী। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সেই ওয়াসওয়াসার কারণে বান্দার পেরেশানিকে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের নিদর্শন বলেছেন। সুতরাং এই বিষয়টা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কোনোভাবেই শয়তানকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। মনের ওয়াসওয়াসার কারণে আমল থেকে দূরে সরা যাবে না। বরং আল্লাহ তাআলার রহমতের ওপর ভরসা রেখে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

কখনো ঈমানের ব্যাপারে মনে ওয়াসওয়াসা এলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। জিকির, তেলাওয়াত, দান-সদকা, নফল নামাজ ইত্যাদি বেশি বেশি করার মাধ্যমে শয়তানের কোমর ভেঙে দিতে হবে।

---

[৯৫] সহিহ মুসলিম : ২৩৮।

আপনার মনে সন্দেহ আসলে আপনি একটা পরীক্ষা করতে পারেন যার দ্বারা বুঝে নিতে পারবেন যে, আপনার ঈমান কী বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে। কুরআন মাজিদে মুমিনের একটা সিফাত বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তার অন্তর প্রকম্পিত হয়, চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং কুরআনের তেলাওয়াত মুমিনের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এবার আপনি কুরআন পাঠ করে দেখুন আপনার এমনটা হয় কি-না। এটার জন্য আপনাকে কুরআনের অর্থ বুঝে পড়তে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনি অর্থসহ পড়ুন। যদি আপনার মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে ঈমানে দুর্বলতা আছে। সে ক্ষেত্রে ঈমান বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে।

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

> যখন তোমাকে নেক কাজ আনন্দ দেবে ও খারাপ কাজ তোমাকে পীড়া দেবে, তখন তুমি মুমিন।'[৯৬]

সুতরাং এর মাধ্যমেও আমরা আমাদের ঈমানকে যাচাই করতে পারি। যদি দেখি নেক কাজ করার দ্বারা আমি আনন্দ পাচ্ছি, আর মন্দ কাজ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তাহলে বুঝে নিতে হবে আমার মাঝে ঈমান আছে। পক্ষান্তরে যদি এর উলটোটা হয় তাহলে আমার ঈমানের চিকিৎসা করাতে হবে। ঈমানকে তাজা করার ও বৃদ্ধি করার চিন্তা করতে হবে।

আমলদার ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করার দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য নফল ইবাদতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। তাই ফরজের পাশাপাশি টার্গেট করে করে নফল আমলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রথমে তাহাজ্জুদের অভ্যাস করা যেতে পারে, এরপর প্রতি মাসে 'আইয়ামে বিজের' তিনটা রোজা রাখা শুরু করা যায়, সপ্তাহে দুইটা রোজা রাখা, দৈনন্দিন বারো রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদাহ খুব গুরুত্ব ও যত্নের সাথে আদায় করা চাই, দৈনন্দিন কিছু পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াতের জন্য সময় বের করা জরুরি, কিছু দ্বীনি বইপত্র পড়ার রুটিন রাখা। ইত্যাদি বিষয়গুলো আস্তে আস্তে আমলে নিয়ে আসা চাই। যখন আপনার নফল ইবাদতসমূহ মজবুত হয়ে যাবে তখন ফরজে

---

[৯৬] মুসনাদু আহমাদ : ২২২২০।

ঘাটতি আসার কোনো সুযোগই থাকবে না। সর্বোপরি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট হেদায়াত চাইব, হেদায়াতের ওপর অবিচলতা প্রার্থনা করব।

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।'

স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হওয়া ছেলেটির মনে অনেক স্বপ্ন। চোখেমুখে অনেক আশা। ভালোভাবে পড়াশোনা করে নামিদামি ভার্সিটিতে ভর্তি হতেই হবে। গড়তে হবে উন্নত ক্যারিয়ার।

সদ্য মাদরাসা শেষ করা ভাইটি, চোখের সামনে ধোঁয়াশা। মাথায় বহু প্রশ্ন। কী করবে? কীভাবে শুরু করবে তার ক্যারিয়ার?

... ক্যারিয়ার। এটা কী? ভালো চাকরি নাকি ব্যবসা?

হাজারো প্রশ্ন মাথায় গিজগিজ করতে থাকে। সঠিক কোনো গাইডলাইন খুঁজে পায় না।

এ সমস্ত তরুণ ভাইদের জন্য আমাদের এই বই—

"মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনা"

কেমন হবে একজন মুমিনের ক্যারিয়ার? টাকা ইনকাম করা ইসলামে অপছন্দনীয় নয়; তবে আছে নির্দিষ্ট রূপরেখা। মূলত ইসলাম ব্যবসা ও ইনকাম করতে উৎসাহ প্রদান করে। ইসলামের ছায়ায় থেকে কীভাবে গড়বে একজন মুমিন তার ক্যারিয়ার। এই বই সেই পথ দেখাবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনে ফেরা ভাইদের জন্য উপকারী কিছু বই

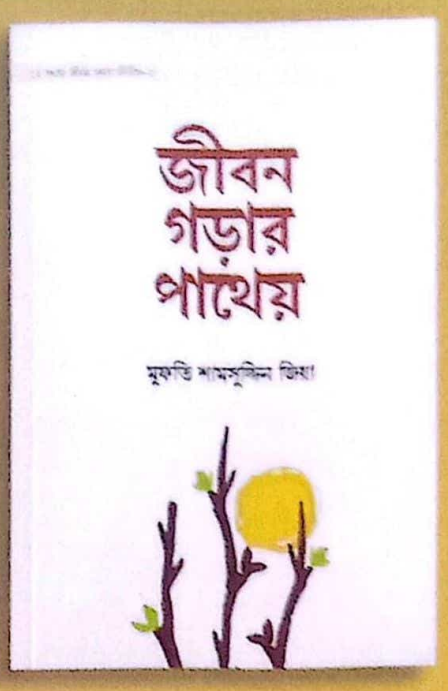

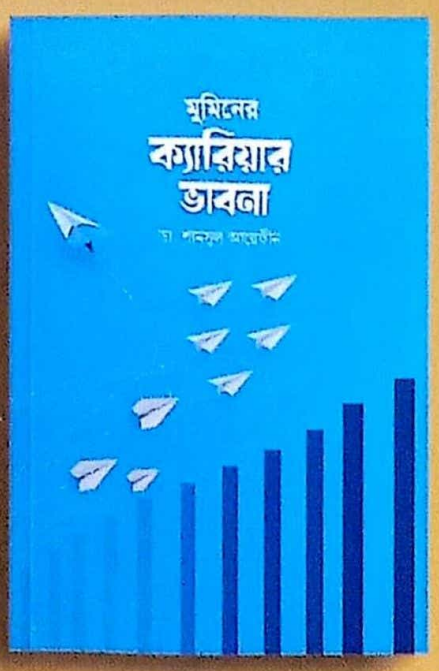

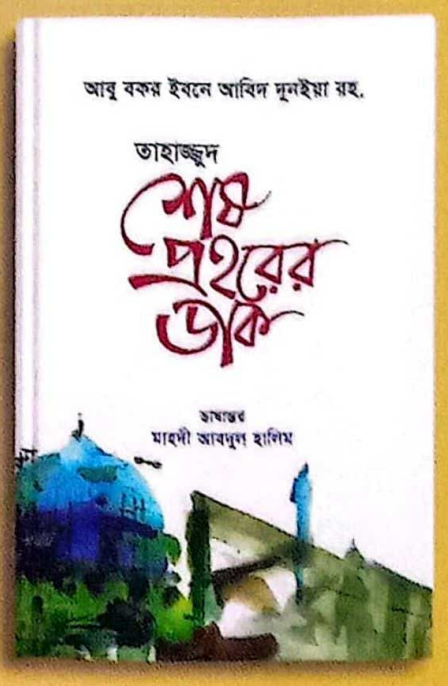

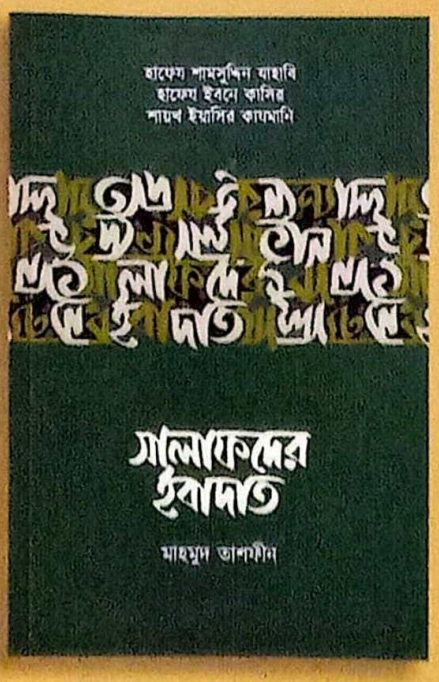

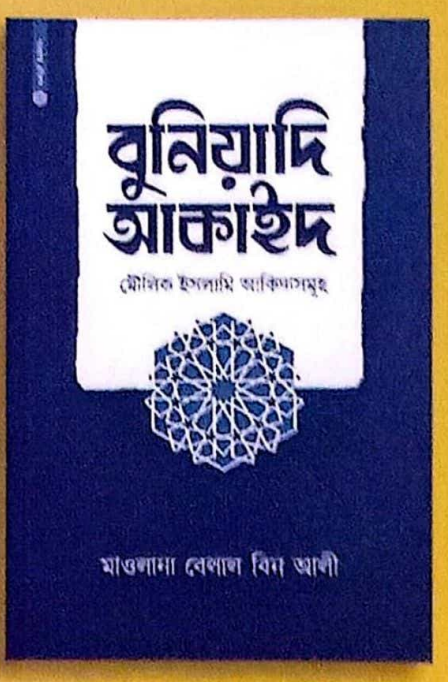

হেদায়াত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অনেক বড় নেয়ামত। কেউ চাইলেই এই নেয়ামত হাসিল করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যাকে পছন্দ করেন। তাকেই কেবল এই নেয়ামত দান করেন।
তবে সবাই হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকতে পারে না। ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে না। হেদায়াত লাভ করা যেমন কঠিন, এই ফেতনার যুগে হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকা আরও কঠিন।

অনেক ভাই দ্বীনে ফিরেন। শরিয়ত মোতাবেক চলেন। অনেক আপু দ্বীনে ফিরেন। নামাজ, রোজা, হিজাব পরেন। শয়তানের ধোঁকায় আবার ভুল পথে হারিয়ে যান। আমরা তো হেদায়াতের পথে আসি। কিন্তু কীভাবে চললে দ্বীনে অটল থাকা যাবে। ঈমানের সাথে চলা যাবে। সেসব বিষয় শিখি না।

মানুষ হেদায়াত প্রাপ্তির পরে কী কী কারণে পথচ্যুত হয়। সেসব কারণ উদ্ঘাটন করে তার সমাধান এই বইতে দেওয়া হয়েছে। দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার জন্য এই বই গাইড হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।